কবরের অন্ধকারে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA.

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

Kabarer Andhakare
Code No 72-K-25

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০
Public Library
Ub Fin. Com. M.R. No. 14454

ছেপেছেন ঃ
বি. সি. মজুমদার
বি. পি. এম'স প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উঃ)

প্রচ্ছদ ঃ
বিজন কর্মকার

দাম ঃ ৪০ টাকা

শ্রীমতী অর্চনা রায়
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ রায়
যুগলেষু

দেব সাহিত্য কুটীরের প্রকাশনায়
এই লেখকের অন্য রহস্য উপন্যাসঃ
অপারেশন এক্স্ ফাইল

সূচী ঃ

কবরের অন্ধকারে ৯
শঙ্খচূড়ের ছায়া ৮৫

কবরের অন্ধকারে

'এক্সকিউজ মি।'

একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের রাত দশটায় সদর স্ট্রিটের মোড়ে ট্রাফিক সিগনাল তখনও লাল। ফুটপাত ঘেঁষে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছিলাম। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ ওই মৃদু কণ্ঠস্বর। চমকে উঠে দেখি, বাঁ দিকে আদ্ধেক ওঠানো কাচের ওপর এক যুবতীর মুখ।

চৌরঙ্গির এই এলাকায় সন্ধ্যা থেকেই ফুলওয়ালা লোকেদের উৎপাত শুরু হয়। তবে তারা নানাবয়সী পুরুষ। কদাচিৎ কোনো ভিখারি বা ভিখারিনী। কিন্তু মুখটি কোনো ভিখারিনীর নয়। স্ট্রিটল্যাম্পের আলো এখানে উজ্জ্বল, যদিও বৃষ্টিরেখা সেই উজ্জ্বলতাকে ঘষে ফেলার চেষ্টা করছিল। যুবতীর মাথায় জড়ানো স্কার্ফ। গায়ে ছাইরঙা জ্যাকেট। আর মুখখানিও মোটামুটি সুশ্রী। কণ্ঠস্বর আর চাহনিকে স্মার্ট বলা চলে।

একপলক এটুকু চোখে পড়ার পর ধরে নিয়েছিলাম নিশ্চিত কোনো কলগার্ল, কিংবা আরও খারাপ কোনো মেয়ে। তাই ঝটপট বলে উঠলাম, 'ডোন্ট্ ডিসটার্ব!'

সে মুখে মিনতি ফুটিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, 'শুনুন না প্লিজ! আমি খুব বিপদে পড়েছি।'

'বিপদে অনেকেই পড়ে—বিশেষ করে রাতের দিকে।'

'ছিঃ! কী ভাবছেন আমাকে? আমি আসলে জানতে চাইছি, আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন।'

'কেন?'

'আমি পার্ক সার্কাসের ওদিকে যাব। কিন্তু ট্যাক্সি পাচ্ছি না। এদিকে বৃষ্টি।'

'বুঝলাম। কিন্তু বিপদটা কী?'

'বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একটু আগে ফোনে খবর পেলাম। আমি কাছেই থাকি। তো ট্যাক্সি না পেয়ে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছি, যদি ওদিকে যেতে কেউ কাইন্ডলি আমাকে লিফ্ট্ দেয়। আপনি কোনদিকে যাবেন?'

'পার্ক স্ট্রিট হয়ে যাব। কিন্তু.....'

এই সময় ট্রাফিক সিগনাল সবুজ হয়ে গেল এবং আমি আর কিছু বলার আগেই মেয়েটি ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লক করে রাখা দরজার হাতল খুলে

গাড়িতে উঠে বসল। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পেছনের গাড়িগুলো প্রচণ্ড হর্ন বাজাতে শুরু করেছে। অগত্যা স্টার্ট দিয়ে এগোতে হলো।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, মেয়েটির পরনে জিনস। হাতে একটা মোটাসোটা হ্যান্ডব্যাগ আছে। চোখে চোখ পড়লে সে একটু হাসল। 'যে-সব গাড়িতে লিফ্‌ট্‌ চাইছিলাম, সেগুলোয় লোকজন আছে। শুধু আপনার গাড়িটা ফাঁকা। পেছনের জানালার কাচ তুলে লক করে রেখেছেন। কিন্তু আমি সামনের জানালা দিয়েই দেখে নিয়েছিলাম, ব্যাকসিটে কেউ নেই।'

যে বাবার অসুখের খবর পেয়ে এমনি করে ছুটে যেতে চায়, তার মুখে ওই হাসিটা বেমানান। অবশ্য একালের ছেলেমেয়েদের হাবভাব একেবারে অন্যরকম। এরা আমার পরের প্রজন্ম। তাই চুপ করে থাকলাম। পার্ক স্ট্রিটে এত রাতে গাড়ির ভিড় স্বাভাবিক বলা চলে। তবে আমি জানি এ সময় বার থেকে বেরুনো অনেকেই ড্রাঙ্ক অবস্থায় থাকে। তাই একটু সতর্কভাবে ড্রাইভ করছিলাম। মাঝে মাঝে একটা করে গাড়ি লাইন ছাড়িয়ে এদিক-ওদিক করছিল। একটু পরে বৃষ্টিটা বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে এলোমেলো হাওয়া এবং মেঘের হাঁকডাক। ওয়াইপার অন করে দিলাম। সামনের কাচ বৃষ্টিতে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে উঠছিল। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছিল। মেয়েটি জানালার কাচ পুরো তুলে দিয়ে আস্তে বলল, 'এবার শীতটা সত্যি পড়বে। তাই না?'

আবার একটা গাড়ি হঠাৎ সামনে এসে গিয়েছিল। তাকে পাশ কাটাতে ডাইনে চলে গেলাম। তারপরই ঘটনাটা ঘটে গেল।

মেয়েটি আমার গা ঘেঁষে এল এবং আমার বাঁ কানের পেছনে শক্ত ঠাণ্ডাহিম কী একটা জিনিসের চাপ টের পেলাম। তারপর তার হুকুম কানে এল, 'ডাইনের রাস্তায় চলুন।'

'তার মানে?'

'যা বলছি করুন। লোডেড ফায়ার আর্মস। ট্রিগারে আঙুল। নড়াচড়া করলে বাঁচবেন না।'

'কী বলছেন!'

'চুপ।'

ততক্ষণে সব বুঝে গেছি। কিন্তু কী আর করা যাবে? বললাম, 'আমি না বাঁচলে গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করবে। তাতে আপনিও অক্ষত থাকবেন না।'

'আমি ড্রাইভিং জানি।' বলে সে তার বাঁ হাত স্টিয়ারিঙে রাখল। 'কাজেই চুপচাপ চলুন। হ্যাঁ—এবার সামনে বাঁ দিকের লেনে ঢোকান।'

এবার ব্যাপারটা সহজভাবে নিলাম। শেষ পর্যন্ত কী ঘটে দেখা যাক।

আমার ফ্রেন্ড-ফিলোসফার-গাইড কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের পাল্লায় পড়ে এ যাবৎ অনেক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে নামতে হয়েছে। এখন শীতকালের এক বৃষ্টিঝরা রাতে অবশ্য আমি একা। এই অ্যাডভেঞ্চার কী ধরনের তাও এখনও বুঝতে পারছি না।

তাহলেও শেষাবধি যদি প্রাণে বেঁচে যাই, দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য একটা ক্রাইম স্টোরির উপকরণ পেতেও পারি। কিংবা রাতের কলকাতার এই ধরনের নতুন থ্রিল নিয়ে কোনো প্রতিবেদনও পাঠকদের মুখরোচক হবে।

মেঘের গর্জন, বৃষ্টি আর হাওয়ার উপদ্রব ক্রমশ বাড়ছিল। এ-গলি থেকে সে-গলি, এ-রাস্তা থেকে সে-রাস্তা দিয়ে সাক্ষাৎ এক 'দস্যুরানীর' হুকুম মেনে কখনও জোরে কখনও আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ফায়ার আর্মসের নলের চাপে কানের পাশটা জ্বালা করছিল। একসময় না বলে পারলাম না, 'প্লিজ! আপনার অস্ত্রটা একটু সরিয়ে নিন। বড্ড ব্যথা করছে।'

সে হিসহিস করে বলল, 'চালাকি করবেন না। চুপচাপ চলুন। এবার ডাইনে বড় রাস্তায়।'

রাস্তা এখন নির্জন। কদাচিৎ একটা করে গাড়ি আসছে বা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন রাস্তায় যাচ্ছি তা চিনতে পারছিলাম না। ধূসরতার ওপর কখনও কখনও আলোর ঝলক। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম, 'দস্যুরানী' বারবার ঘড়িতে সময় দেখছিল।

অন্য কেউ হলে একটা চেষ্টা অন্তত করত। আচমকা ব্রেক কষেই মাথা সরিয়ে নিয়ে মেয়েটির কবজি ধরে ফেলত। কিংবা অন্য কৌশলের অভাব হতো না। কেন না এই যাত্রার সময়টা ছিল বেশ দীর্ঘ। আমার বয়সী এবং আমার মতো অভিজ্ঞ কোনো পূর্ণ যুবকের পক্ষে এই মেয়েটিকে কাবু করার ঝুঁকি যে-কেউই নিত। কিন্তু আমি একজন সাংবাদিক। আমার পক্ষে শেষদৃশ্য পর্যন্ত অপেক্ষা করাই সঙ্গত।

তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, হলিউডের অ্যাকশন-থ্রিলার ফিল্মে যা আকছার দেখেছি, তা আমার জীবনে ঘটবে, এবং এই 'মুমূর্ষু নগরী' কলকাতায় এমন কিছু ঘটতে পারে, এটা একেবারে কল্পনাতীত ব্যাপার। কাজেই এটা উপভোগ্য। কিন্তু এই সাংঘাতিক থ্রিলারে এটুকুই আমার কাছে তেতো যে, ভিলেন-চরিত্র একটি মেয়ে এবং আমি একজন পুরুষ। 'মেল শোভিনিস্ট' আমি নই। তবু পুরুষ তো বটে! সেই পুরুষত্বে খোঁচা খেতে খেতে আমি অস্থির। ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলাম।

একসময় ব্যাকভিউ মিররে দেখলাম একটা গাড়ি আসছে পেছন থেকে।

ইচ্ছে করেই গাড়িটাকে সাইড দিলাম না। পেছনের গাড়িটা জোরালো আলো ফেলছিল। বারবার হর্ন দিচ্ছিল। পুলিশের গাড়ি হলে মন্দ হতো না। কিন্তু ততক্ষণে ফায়ার আর্মসের নল আমার কানের পাশে রীতিমতো গুঁতো মারতে শুরু করেছে এবং সেইসঙ্গে সাপের হিসহিস গর্জনে মেশানো হুকুমদারি, 'সাইড দিন! সাইড দিন বলছি।'

গাড়িটা ডানদিক ঘেঁষে এল। তার ড্রাইভার হিন্দিতে কী সব খিস্তি করে তারপর এগিয়ে গেল। বললাম, 'বৃষ্টিতে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর কতদূর যেতে হবে?'

'কোনো চালাকি নয়। সামনের গাড়িটাকে যেতে দিন।'

চোখ ঝলসে দিয়ে সামনে থেকে একটা গাড়ি এসে চলে গেল। পাশ দিয়ে যাবার সময় দুঃখের সঙ্গে দেখলাম, একটা পুলিশভ্যান। কিন্তু কী আর করা যাবে? 'দস্যুরানীকে' ক্রমশ যেন উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে ঠোঁট কামড়ে ধরছিল। তারপর হুকুমদারি, 'ডাইনে'... 'এবার সোজা'...'বাঁদিকে'...

বুঝতে পারছিলাম সে বড় রাস্তা এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু এটাই আশ্চর্য, কলকাতার নাড়িনক্ষত্র যেন তার চেনা।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, 'ড্রাইভ করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি ক্লান্ত।'

'বেশ তো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আস্তে চলুন। কিন্তু বাইরে কারও সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেই ট্রিগার টানব।'

'একটা সিগারেট খেতে পারি?'

'চালাকি ছাড়ুন! নো টক।'

'প্লিজ! আমার কানের পাশটা বড্ড জ্বালা করছে। অস্ত্রটা সরিয়ে নিন। বিশ্বাস করুন, আপনি যেখানে যেতে চান পৌঁছে দেব।'

'আবার কথা বলে! সাবধান করে দিচ্ছি, আজ আমার মেজাজ ঠিক নেই।'

ধমকের সঙ্গে ফায়ার আর্মসের নলের জোরালো খোঁচা খেয়ে যন্ত্রণায় 'উহ্' করে উঠলাম। স্টিয়ারিং থেকে হাত একটু সরে গিয়েছিল। 'দস্যুরানী' বাঁ হাতে দ্রুত স্টিয়ারিং ধরে গাড়িটাকে একটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে বাঁচিয়ে দিল। এখানে ফুটপাত সংকীর্ণ। দুধারে সারবন্দী গাছ। টানা পাঁচিল এবং মাঝে মাঝে একটা করে গেট দেখা যাচ্ছিল। রাস্তা স্বভাবত জনহীন। বৃষ্টিটা একটু কমে এসেছে। কিন্তু মেঘের গর্জন থামছে না। পশ এরিয়া বলে মনে হচ্ছিল। রাস্তাটা পাশাপাশি দুটো গাড়ি যাওয়ার মতো চওড়া এবং এঁকেবেঁকে

এগিয়েছে। কোনো গাড়ি আব দেখছি না। একটা বাঁকেব মুখে পৌঁছতেই সে বলে উঠল, 'এখানে নামিয়ে দিন। চ্যাঁচামেচি বা সিন ক্রিয়েট কববেন না। আমি টার্গেট মিস কবি না, মাইন্ড দ্যাট।'

গাড়ি দাঁড় কবালাম। সে আমাব কানেব পাশে আগ্নেয়াস্ত্রেব নল ঠেকিয়ে বেখেই বাঁ হাতে দবজা খুলল। তাবপব নেমে গেল এবং আস্তে বলল, 'ধন্যবাদ! আপনাব গাড়ি ছিনতাই কবাব দবকাব হলো না।'

আমি কিছু বলাব আগেই সে গাড়িব পেছন দিযে অন্য পাশেব ফুটপাতে উঠল। উঁকি মেবে দেখাব সাহস হলো না। আস্তেসুস্থে একটা সিগাবেট বেব কবে ধবালাম। কমালে বাঁ কানেব পাশটা ঘষে ড্যাশবোর্ডেব আলোয় দেখে নিলাম। না। বক্ত-টক্ত ঝবছে না, যদিও মনে হচ্ছিল ঠাণ্ডাহিম নলেব গুঁতো খেযে বক্ত ঝবছে।

কিন্তু এখানে আব থেমে থাকা উচিত নয। সামনে কিছুদূব এগিযে ফুটপাতে একটা ছোট্ট দোকান চোখে পড়ল। দোকানটা পান-সিগাবেটেব। দোকানদাব সবে ঝাঁপ ফেলতে যাচ্ছিল। আমাকে গাড়ি দাঁড কবাতে দেখে জিজ্ঞেস কবল, 'বোলিযে সাব!'

'ইযে কৌন ইলাকা ভাই?'

'হেস্টিংস, সাব!'

'ইধাব কৈ বডা বাস্তা হ্যায?'

লোকটা আমাব হিন্দি শুনে এবাব বাংলায বলল, 'আপনি কোথা যাবেন?'

'পার্ক স্ট্রিট।'

সে প্রায চোখ কপালে তুলে বলল, 'পার্ক স্ট্রিট! তো এদিকে কোথা যাচ্ছেন?'

'পথ হাবিযে ফেলেছি।'

সে হাসল। 'গাড়ি ঘুবিযে লিন সাব! সিধা এই বাস্তায় চলে যান। তাবপব বড বাস্তা পাবেন। বেসেব ময়দান, ভিক্টোবিযা—'

তাব বাকি কথায আব কান দিলাম না। বাঁ দিকে একটা গলি দেখা যাচ্ছিল। সেখানে গাড়ি ঘুবিয়ে জোবে বেবিয়ে গেলাম। এই বাস্তায কোনো একটা গলি দিযে ঢুকেছিলাম। সেটা চিনতে পাবলাম না বা চেনাব চেষ্টাও কবলাম না। শুধু এটুকু বুঝতে পাবছিলাম, সাংঘাতিক মেয়েটি আমাকে শর্টকাটে এমনভাবে এনেছে, যাতে আমি এলাকাটা চিনতে না পাবি।

কিন্তু এখন আব ও-সব কথা ভেবে লাভ নেই। রাত প্রায় এগাবোটা বাজে। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে এবং মেঘেব গর্জনে

কানে তালা ধরে যাচ্ছে। খোলা রাস্তায় গঙ্গা এবং ময়দানের ওপর ঠাণ্ডাহিম হাওয়া যথেচ্ছ দাপাদাপি করছে। পার্ক স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত জোরে গাড়ি চালিয়ে এসে গতি কমালাম।

ইলিয়ট রোডে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর কাছে নিজের এই বোকামিভরা অ্যাডভেঞ্চারের ঘটনাটা শুনিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এত রাতে ওঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে কি?

তাছাড়া আমাকে ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে সল্টলেকে ফিরতে হবে।

তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, সোজা নিজের ডেরায় ফেরা যাক। তারপর সকালে টেলিফোনে কথা বলে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে আসব। কেন না, ঘটনাটা বেশ কিছুটা গোলমেলে। কোনো ডানপিটে মেয়ে কোথাও যাওয়াব জন্য এত বেশি নাটকীয় ঘটনা ঘটাবে কেন?

ক্রমশ চাপা অস্বস্তি আমাকে পেযে বসছিল। ইস্টার্ন বাইপাসে পৌঁছে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম। কলকাতায় এবার জানুয়ারিতেও তত শীত পড়েনি। ফেব্রুয়ারির এই বৃষ্টিটা শীত এনে দিল। এতক্ষণে আমার হাত স্টিযাবিঙেব শৈত্য টের পাচ্ছিল।...

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। সকাল নটা নাগাদ ব্রেকফাস্টের পব ধীবেসুস্থে কর্নেলকে টেলিফোন করতে যাচ্ছি, সেইসময় টেলিফোন বেজে উঠল এবং রিসিভার তুলেই তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। 'মর্নিং জয়ন্ত!'

'মর্নিং বস্। মেঘ না চাইতেই জল। আমি আপনাকে এক্ষুণি—'

'এক মিনিট! জয়ন্ত, তোমার গাড়ির নাম্বার কত?'

একটু অবাক হযে নাম্বাবটা বলে জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ গাডির নাম্বারের কথা কেন?'

'আমার অবশ্য তোমার গাডিব নাম্বার মুখস্থ। তবু যাচাই কবে নিলাম। যাই হোক, তোমার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে!'

'দুঃসংবাদ মানে?'

'তুমি বিপন্ন ডার্লিং!'

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'কাল রাতে তুমি কি হেস্টিংস এরিয়ায় গিয়েছিলে?'

উত্তেজনা চেপে বললাম, 'যেতে হয়েছিল। ব্যাপারটা সাংঘাতিক।'

'হ্যাঁ। খুবই সাংঘাতিক। ক্লিফটন রোডে একটা মার্ডার হয়েছে এবং—'

'মার্ডার! সর্বনাশ!'

'কথা শেষ করতে দাও। মার্ডারার তোমারই গাড়িতে গিয়েছিল। গাড়ির নাম্বার পাশের বাড়ির দারোয়ান লক্ষ্য করেছিল। জয়ন্ত, তোমার গাড়ির নাম্বারটা এমন যে দেখামাত্র মুখস্থ হয়ে যায়। যাই হোক, পুলিশ গাড়ির মালিককে খুঁজছে।'

প্রায় আর্তনাদ বেরিয়ে গেল গলা থেকে। 'কর্নেল! আমি এখনই যাচ্ছি। আপনার সবটা শোনা দরকার।'

'এস। তবে গাড়িটা এনো না। ট্যাক্সি করে এস।'

রিসিভার রেখে সিগারেট ধরালাম। কিছুক্ষণের জন্য গাঢ় আচ্ছন্নতা আমাকে পেয়ে বসল। তারপর ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠলাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, গত রাতে ঘটনাটা হেস্টিংস থানায় জানিয়ে আসা উচিত ছিল। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। স্রেফ বোকামির জন্য অনর্থক একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে। সমস্যা হলো, পুলিশ তাদের নিজের পথে চলে। কর্নেল আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা তো করবেনই। কিন্তু গত রাতের হলিউডি অ্যাকশন-ফিল্মের ওই এপিসোড যে প্রকৃত বাস্তব, তা পুলিশকে বোঝানো তাঁর পক্ষেও সম্ভবত কঠিন হবে।...

।। দুই ।।

ঘটনাটা আমার মুখে সবিস্তারে শোনার পর কর্নেল প্রথমে অট্টহাসি হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁকে আমার বাঁ কানের পাশটা দেখিয়ে দিলাম। কারণ সকালে দাড়ি কাটার সময় আয়নায় দেখেছিলাম একটুখানি জায়গা তখনও লাল হয়ে আছে। অ্যান্টিসেপটিক মলমও ঘষে দিয়েছিলাম।

কর্নেল সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ক্লিফটন রোডের সেই দারোয়ান পুলিশকে বলেছে, গাড়িটা ক্রিমরঙা। কাজেই সে ঠিক দেখেছিল। তোমার গাড়ি থেকে জিনস-জ্যাকেট পরা মেয়েটিকেও সে নামতে দেখেছিল। তারপর মেয়েটি ফুটপাত ধরে এগিয়ে যায়। এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। আব—হ্যাঁ, তোমার গাড়ি কিছুটা এগিয়ে বাঁকেব মুখে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পরে আবার গাড়িটা ফিরে আসে এবং উল্টোদিকে জোবে চলে যায়।'

'কিন্তু কাকে সে খুন করতে গিয়েছিল?'

'প্রদীপ সিনহাকে। ভদ্রলোকের অনেকরকম কারবাব আছে। ফিল্ম প্রোডাকশন, রিয়্যাল এস্টেট বেচাকেনা, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ইত্যাদি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।'

ওঁর কথা বলাব ভঙ্গিতে বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ডিটেলস বলুন না! কীভাবে ওঁকে খুন করা হয়েছে, আপনিই বা কোন সূত্রে—'

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, 'ক'দিন আগে প্রদীপ সিনহাব স্ত্রী মালবিকা আমার কাছে এসেছিল। তার সন্দেহ হয়েছিল, তার স্বামী কোনো বিপজ্জনক ফাঁদে পা দিয়েছে। ওঁকে যেন সাবধান করে দিই। তো মালবিকা আমার পরিচিত। তার বাবা অশোক বায় ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসময় নামকরা শিকারী ছিলেন।' কর্নেল একটা চুরুট ধরালেন। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কাল রাত বারোটায় মালবিকা আমাকে ফোন করেছিল। তার স্বামী বিছানা থেকে কখন নিপাত্তা হয়ে গেছেন। আমি ওকে বললাম, পুলিশে খবর দাও। পুলিশ এসেছিল ঘণ্টাখানেক পরে। ততক্ষণে বাড়ির দারোয়ান নরবাহাদুর তার মালিকের লাশ আবিষ্কার করেছে। প্রদীপ সিনহা বাড়ির পেছনে বাগানেব একটা ঝোপের পাশে কাত হয়ে পড়ে ছিলেন। মাথার বাঁ দিকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে কেউ ওঁকে গুলি করে পালিয়েছে। পালিয়েছে পেছনের দরজা দিয়ে। ওদিকে একটা কানাগলি আছে।'

কর্নেল চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন। একটু পরে বললাম, 'দারোয়ান সেই মেয়েটাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেনি?'

'নাহ্। তার মানে, প্রদীপ সিনহা তার জন্য বাগানের দরজা খুলে রেখে অপেক্ষা করছিলেন।'

'পরের ঘটনা আপনি কি পুলিশসূত্রে জেনেছেন?'

'নাহ্।' কর্নেল মাথা নাড়লেন। 'মালবিকা ভোর ছটায় আবার ফোন করেছিল।'

চোখ বুজে উনি অভ্যাসমতো ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। একটু পরে বললাম, 'আচ্ছা কর্নেল! এমন তো হতেই পারে, খুনী যে গাড়িতে চেপে গিয়েছিল, তার নাম্বারপ্লেট ভুয়ো। দৈবাৎ আমার গাড়ির নাম্বারের সঙ্গে মিলে গেছে। গাড়ির রঙটাও—'

কর্নেল চোখ খুলে হাসলেন। 'হ্যাঁ। এটা হতেই পারে। কিন্তু তা হয়নি।'

'প্লিজ কর্নেল! পুলিশকে আসল কথাটা না বললেই ঝামেলা মিটে যায়।'

কর্নেল আমার দিকে একটুখানি তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'তুমি সহজে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হচ্ছে না। পুলিশ মোটর ভেহিক্‌ল্‌সে গাড়ির মালিকের নাম-ঠিকানা পেয়ে যাবে। তারপর তোমাকে জেরায় জেরবার করে ছাড়বে। তোমার পত্রিকা অফিসে খোঁজ নেবে, কখন তুমি বেরিয়েছিলে। তারপর সল্টলেকে তোমার প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নেবে কখন তুমি ফিরেছিলে!'

'ওঃ কর্নেল! আপনি ভয় দেখাচ্ছেন।'

'মোটেও না। এটাই পুলিশের তদন্তপদ্ধতি।' কর্নেল মিটিমিটি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'পাশের বাড়ির দারোয়ান ছাড়াও তোমার গাড়ির ওখানে যাওয়ার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী সেই পান-সিগারেটের দোকানদার।'

এবার প্রচণ্ড অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে পড়লাম। সত্যিই আমি বোকার ধাড়ি। যে কোনো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এসব ক্ষেত্রে পুলিশকে ঘটনাটা জানাত! আসলে কাল রাতে আমাকে যেন বিবশ করে ফেলেছিল জিনস পরা সেই মেয়ে-খুনী। আমার বোধবুদ্ধি গুলিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে পোশাক বদলে ফিরে এলেন। 'চলো বেরুনো যাক। এ সময় তোমার গাড়িটা পেলে ভালো হতো। কিন্তু—' বলে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। 'ডার্লিং! আসলে তুমি বড্ড বেশি রোমান্টিক। যাই হোক, চলো।'

'কোথায় যাবেন?'

'মালবিকা সিনহার কাছে।'

'আমার যাওয়া কি উচিত হবে? যদি সেই দারোয়ান লোকটা আমাকে চিনতে পারে?'

'দেখা যাক। এস তো।'

অস্বস্তিটা সঙ্গ নিল। বড় রাস্তার মোড়ে কর্নেল ট্যাক্সি ডাকলেন। বরাবর দেখে আসছি, ওঁর সায়েবি বিশাল চেহাবা এবং সম্ভবত সাদা দাড়ির জন্য কোনো ট্যাক্সিচালক ওঁকে না করে না। নাকি ওঁর গলা থেকে ঝোলানো বাইনোকুলার আর ক্যামেবা দেখে ওঁকে বিদেশি ট্যুরিস্ট ভাবে এবং মোটা বখশিসের লোভে পড়ে যায়?

ট্যাক্সি চলল কর্নেলের নির্দেশে। সেই খুনী মেয়েটির মতো কলকাতার নাড়িনক্ষত্র কর্নেলেবও চেনা। কিন্তু ক্রমশ আবাব অস্বস্তি আমাকে আড়ষ্ট করে ফেলছিল। বললাম, 'মিসেস সিনহাকে টেলিফোনে জানিযে আসা উচিত ছিল যে আপনি যাচ্ছেন!'

কর্নেল বললেন, 'আমি যাব তা মালবিকা জানে। অবশ্য কখন যাব তা বলিনি।'

একটু ইতস্তত কবে বললাম, 'আচ্ছা কর্নেল, যে দাবোয়ান আমাব গাড়ির নাম্বার দেখেছিল, আমাকে দেখে যদি সে চিনতে পাবে?'

কর্নেল হাসলেন। 'আগে তাব সঙ্গে কথা বলে যেতে চাই।' বলে আমার দিকে ঘুরলেন। 'পাশের বাড়ির সেই দারোয়ানেব দৃষ্টিশক্তি যাচাই হযে যাবে। তবে তোমার এতে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বৃষ্টির মধ্যে আবছা আলোয দেখা কোনো মুখ মনে রাখা খুব সহজ নয। বুঝতে পাবছি তুমি বলতে চাও যে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম কেন। তাই না?'

চুপচাপ তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল ফের বললেন, 'এটা তোমার মাথায় আসা উচিত ছিল। আমি দেখতে চাই কোথায় তোমাকে গাড়ি থামাতে হয়েছিল এবং সেই মেয়েটি নেমে গিয়েছিল। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।'

হেস্টিংস এলাকা দিনের বেলায় স্বভাবত অন্যবকম দেখাচ্ছিল। শীতটা সত্যি জাঁকিয়ে পড়েছে। বড় রাস্তা থেকে ডাইনে ঘুরে একটা ছোট বাস্তায় ঢুকে কর্নেল বললেন, 'এটাই ক্লিফটন রোড। চিনতে পারছ কি?'

বললাম, 'হ্যাঁ। তবে মেয়েটি কোথায় আমাকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলেছিল, চিনতে পারছি না।'

'পারবে। পারা উচিত।' বলে কর্নেল ডাইনে সংকীর্ণ ফুটপাতের ওধারে টানা পাঁচিল দেখতে থাকলেন।

রাস্তাটা বাঁক নিতে নিতে এগিয়ে গেছে। কিছুটা চলার পর কর্নেল ট্যাক্সিচালককে থামতে বললেন। তারপর ভাড়া মিটিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাতে নামলেন। আমি নেমে গিয়ে জায়গাটা চেনার চেষ্টা করলাম। ট্যাক্সিটা আস্তেসুস্থে এগিয়ে সামনের বাঁকের মুখে অদৃশ্য হলো। রাতের রাস্তার সঙ্গে দিনের রাস্তার কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না, শুধু দুধারের একটানা উঁচু বা নিচু পাঁচিল ছাড়া। কর্নেল রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকের ফুটপাতে গেলেন। সেখানে একটা বাড়ির গেট এবং ফুটপাতের খানিকটা অংশ ঢালু। বাড়িটাতে গাড়ি ঢোকার জন্য এই ব্যবস্থা। গেটের পাশেই একতলা একটা ঘর। ঘরটার একটা জানালা খোলা আছে। জানালাটা ঠিক ফুটপাতের ওপর এবং জানালা থেকে রাস্তাটা সামনাসামনি দেখা যায়।

বাড়িটার গেটের বাঁ দিকে মার্বেল ফলকে ইংরেজিতে লেখা আছে 'সুরঞ্জনা'। নুড়ি বিছানো পথের দুপাশে রঙবেরঙের ফুলের গাছ। তারপর পোর্টিকো। বাড়িটা দোতলা। কিন্তু বিদেশি স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। ঝকমকে লাল টালির ঢালু ছাউনির মধ্যে জ্যামিতিক ধাঁচ।

কর্নেল গেটের সামনে যেতেই বেঁটে নধরকান্তি একটা গুঁফো লোক এসে দাঁড়াল। তারপর সম্ভবত কর্নেলের চেহারা দেখেই স্যালুট ঠুকল। কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন, 'এটা কি সিনহাসায়েবের বাড়ি?'

তক্ষুণি বুঝেছিলাম এই লোকটিই সেই দারোয়ান, যে আমার গাড়ির নাম্বার দেখেছিল। সে ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বলল, 'না সার! সিনহাসায়েবের বাড়ি ওইটা আছে। লেকিন—'

'৭ নম্বর ক্লিফটন রোডে সিনহাসায়েবের বাড়ি না?'

কুতকুতে চোখে সে হাসল। 'এটা ৬ নম্বর আছে।'

'হ্যাঁ। আমারই ভুল। এ বাড়িটা কার?'

'মুখার্জিসায়েবের।'

কর্নেল মার্বেল ফলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সরি! এটা এস. কে. মুখার্জির বাড়ি।' তারপর আমার দিকে ঘুরে চোখে একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'জয়ন্ত! তুমি এর সঙ্গে কথা বলতে পারো।'

আমি বুঝতে পারলাম না ওর সঙ্গে কী কথা বলব। কিন্তু কর্নেলের কথা শুনে সুরঞ্জনার দারোয়ান সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন সার?'

কর্নেল বললেন, 'নিউজপেপার থেকে। পুলিশের কাছে খবর পেয়েছি,

গত রাতে প্রদীপ সিনহা নামে এক ভদ্রলোককে কে বা কারা নাকি মার্ডার করে গেছে। তো কাগজের লোকেরা পাশের বাড়ির লোকের কাছেও ঘটনাটা জেনে নিতে চায়। তো তোমার নাম কী ভাই?'

'আমি ফাগুলাল আছি সার!' বলেই সে চঞ্চল হয়ে উঠল। 'আপনারা নিউজপেপার থেকে আসছেন? সকালে অনেক নিউজপেপারের লোক এসেছিল। আপনারা দেরি করে আসলেন!'

'জয়ন্ত, তুমি রিপোর্টার'স নোটবই বের করো। ফাগুলাল কী বলে লিখে নাও।'

অগত্যা পকেট থেকে একটা খুদে নোটবই বের করলাম। ফাগুলাল গেটের ফাঁকে তার মুখটা প্রায় গলানোর চেষ্টা করল। বলল, 'নিউজপেপারেব লোকেবা কেউ আমাকে কুছু পুছ করেনি। তাহলে খাঁটি খবর পেয়ে যেত। স'র! যে গাড়িতে খুনী এসেছিল, সেটা থেমে গিয়েছিল ওইখানে। আমি জানালাব ধারে বসেছিলাম। তাই গাড়ির লম্বর—'

কর্নেল তাকে থামিয়ে বললেন, 'তখন রাত কটা মনে আছে?'

'এগারা কি সও-এগারা হবে।'

'অত রাতে তুমি জানালার ধারে বসেছিলে কেন?'

'আমার সায়েব কেলাবে যান। আসতে বহৎ রাত হয়ে যায়।'

'তা হলে মুখার্জিসায়েবের জন্য অপেক্ষা করছিলে বলো?' বলে কর্নেল আমার দিকে আগের মতো তাকিয়ে চোখের সেই ভঙ্গি করলেন। 'জয়ন্ত, লিখে নাও।' তারপর কর্নেল ফাগুলালের দিকে ঘুরলেন। 'গাড়িটা এসে দাঁড়াল। তারপর?'

'আগে গাড়ির লম্বর লিন।' বলে সে আমার গাড়ির নাম্বার সঠিক বলে দিল। 'তো আমি দেখলাম, গাড়ি থেকে এক লড়কি নেমে এই গেটের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে।'

'লড়কি? পরনে শাড়ি ছিল তাহলে?'

'না সার! প্যান্ট ছিল। লেকিন মাথায় রুমাল বাঁধা। মুখ দেখেই চিনে নিলাম লড়কি আছে।'

'তারপর সে কী করল?'

'৭ লম্বর বাড়ি আর এই ৬ লম্বর বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালের মধ্যে ছোটা এক গলি আছে। সিরফ্ তিন হাত গলি। লড়কি গলিতে ঢুকে গেল।'

'জানালা থেকে দেখতে পাচ্ছিলে?'

ফাগুলাল বাঁকা হাসল। 'আপনি সমঝে লিন। ৭ নম্বর বাড়ির গেট আমার নজর হয়। কেন? কি—আপনি দেখে লিন, রাস্তা জেরাসা বাঁদিকে ঘুরেছে। দেখলেন কি না?'

কর্নেল দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। আচ্ছা ফাগুলাল, এবার বলো গাড়িটা কী করল?'

'গাড়ি সামনে চলে গেল। মিনিট দো-চার বাদ ঘুবে এল। বহৎ স্পিডে চলে গেল।'

'ড্রাইভারকে দেখতে পেয়েছিলে?'

ফাগুলাল মাথা নাড়ল। 'না সাব! ঝুটমুট কেন বলব?'

'মুখার্জিসায়েব কখন ফিবেছিলেন?'

'আধাঘণ্টা বাদ। তারপব—'

'এক মিনিট। তুমি গাড়িটাব কথা বা মেয়েটির কথা মুখার্জিসায়েবকে বলেছিলে?'

ফাগুলাল গম্ভীব মুখে বলল, 'তখন কেন বলব বলুন? আর সিনহাসায়েবের কথা বলবেন না। কত লড়কি উনহিব বাড়িতে যানা-আনা করত। হরঘড়ি—' চোখে চটুল হেসে সে চাপা গলায় ফের বলল, 'সিনেমার লোকের কারবার!'

'তার মানে রাত্রেও।'

'হাঁ সার!' ফাগুলাল শ্বাস ছেড়ে বলল, 'তো আমাব সায়েব বাড়ি ঢুকলেন। তাব পন্দেব-বিশ মিনিট বাদ এসে আমাকে গেট খুলতে বললেন। আমি কুছু বুঝতে পারলাম না। একঘণ্টা বাদ সায়েব ফিবে এলেন। আমাকে বললেন, সিনহা মার্ডার হয়েছে। তো ব্যস!' ফাগুলাল উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'আমি সায়েবকে সেই গাড়ি আর লড়কিব কথা বললাম। পবে যখন পুলিশ আসল, পুলিশকে ভি বললাম।'

রাস্তায় মাঝে মাঝে গাড়ি এবং লোকজন যাতায়াত করছিল। কেউ-কেউ সম্ভবত কর্নেলের চেহারা দেখে একটু কৌতূহলী হয়ে পড়ছিল। কর্নেল নিশ্চয় আঁচ করলেন, ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠতে পারে। বললেন, 'ঠিক আছে ফাগুলাল! আমরা চলি। জয়ন্ত, এই যথেষ্ট! চলো, সিনহাসায়েবের বাড়িতে যাওয়া যাক।'

টানা পাঁচিল এগিয়ে গেছে প্রায় কুড়ি মিটার। তারপর সেই সংকীর্ণ গলিটা দেখতে পেলাম। গলিতে কেউ হাঁটে বলে মনে হলো না—অন্তত আপাতদৃষ্টে। কোন আমলে পিচ পড়েছিল, তার একটু-আধটু চিহ্ন আছে মাত্র। খানাখন্দে

রাতের বৃষ্টির জল জমে আছে। এবড়ো-খেবড়ো পাথরকুচির ওপর দুধারের বাড়ি থেকে গাছপালার পাতা পড়ে গলে পচে গেছে। কর্নেল গলিতে ঢুকে পড়লেন।

সামনে প্রায় পঁচিশ মিটার দূরে ৭ নম্বর বাড়ির গেটটা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। কর্নেল চাপা গলায় ডাকলেন, 'হাঁ করে কী দেখছ? চলে এস।'

ওঁকে অনুসরণ করলাম। গলিটা বেজায় সংকীর্ণ। পাশাপাশি কোনোক্রমে দুজন যাতায়াত করতে পারে। দুধারে মুখার্জিসায়েব এবং সিনহাসায়েবের বাড়ির পাঁচিল এখানে খুব উঁচু এবং কাঁটাতারের বেড়ায় ঘন লতাপাতার ঝালর। গলিটার অবস্থান এমন জায়গায়, যেখানে একটুও রোদ পড়ে না। কর্নেল একখানে একটু ঝুঁকে আস্তে বললেন, 'ফাগুলাল ঠিক বলেছে। মেয়েটি গলিতে ঢুকেছিল। জুতোর ছাপ দেখা যাচ্ছে।'

আমি কিছু দেখতে পেলাম না। কিছুটা এগিয়ে গলিটা বাঁ দিকে ঘুরেছে এবং সামনে আরও উঁচু একটা পাঁচিল। পাঁচিলে জীর্ণতার গাঢ় ছাপ, যেন এখনই ধসে পড়বে। কর্নেল একবার দেখে নিয়েই বললেন, 'পোড়ো কারখানা সম্ভবত। এমনও হতে পারে জায়গাটা নিয়ে মামলা চলছে।'

বলেই উনি থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এটা সে অর্থে কানাগলি নয়। সামনে বটগাছটা দেখতে পাচ্ছ। তার নিচে একটা ডোবা।'

কর্নেলের পেছনে ছিলাম। তাই বটগাছ বা ডোবাটা দেখতে পাইনি। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, বাঁ দিকে একটা বন্ধ দরজা। বললাম, 'এই দরজা দিয়েই তাহলে—'

কর্নেল ইশারায় আমাকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ আবার ঝুঁকে পড়লেন। তারপর পচা পাতা আর জলভর্তি একটা গর্ত থেকে যে জিনিসটা তুলে নিলেন, সেটা একটা খুদে ফায়ার আর্মস। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি। কর্নেল কালো রঙের সেই অস্ত্রটা পরীক্ষা করার পর আপনমনে একটু হাসলেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে জলকাদামাখা অস্ত্রটা তাতে জড়িয়ে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান দিলেন।

এতক্ষণে বললাম, 'মার্ডার উইপন!'

কর্নেল ঘুরে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'সম্ভবত এর নলের গুঁতোয় তোমার কানের পাশটা লাল হয়ে আছে এখনও!'

উত্তেজিতভাবে বললাম, 'কিন্তু পুলিশের এটা চোখে পড়া উচিত ছিল!'

'না পড়ার একটাই কারণ থাকতে পারে। পুলিশ এই দরজার পর বটগাছটার দিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার মনে করেনি। তাছাড়া এখানে ফায়ার আর্মস কেনই বা খুনী ফেলে যাবে? একটা ফায়ার আর্মসের দাম কম নয়।'

বলে কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন, যেদিক থেকে এসেছিলাম, সেই দিকে। ওঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমার জুতো জলকাদা আর পচাপাতায় নোংরা হয়ে গেল।

এবার ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে ৭ নম্বর বাড়ির গেটে পৌঁছলাম। গেটটা বন্ধ। ভেতরে ঝাঁপালো বোগেনভিলিয়ার ছায়ায় বেঞ্চ পেতে দুজন বন্দুকধারী কনস্টেবল বসে আছে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে একটা শক্তসমর্থ চেহারার লোক খৈনি ডলছে। এ বাড়ির গেটের ফলকে শুধু লেখা আছে 'অনুপমা'। পাশের দেয়ালে পুরসভার মরচে-ধরা নীলরঙের একটা ফলকে লেখা 'ক্লিফটন রোড'।

কর্নেল গলার ভেতর বললেন, 'কদিন আগে এ বাড়িতে এসেছিলাম। দেখা যাক, নরবাহাদুর আমাকে চিনতে পারে কি না।'

বলে উনি একটু কাশলেন। কাশি শুনে ওরা তিনজনই তাকাল। তারপর খৈনি ডলা থামিয়ে নেপালি দারোয়ান নরবাহাদুর এগিয়ে এল। সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিল সে। তারপর সবিনয়ে বলল, 'মেমসাব কর্নিলসাবের জন্য ওয়েট করছেন।'

কথাটা বলে সে ডাকল, 'লখিয়া! এ লখিয়া!'

ফ্রক পরা একটি কিশোরী পোর্টিকোর ছাদে দাঁড়িয়েছিল। সে ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'বলো কী বলবে?'

'মেমসাবকে খবর দে। কর্নিলসাব এসেছেন!'

'মেমসাহেব শুয়ে আছেন। আমাকে বলে দিয়েছেন কেউ যেন ডিসটার্ব না করে।'

নরবাহাদুর খাপ্পা হয়ে বলল, 'মাবকে মুখ তোড় দে গা। বোল্—কর্নিলসাব এসেছেন।'

'কে এসেছেন?'

'কর্নিলসাব।' বলে সে আমাদের দিকে ঘুরল। 'বহৎ হারামি আছে, বুঝলেন সার? আপনারা অন্দরে চলে যান। বাচ্চুকে থানায় লিয়ে গেল। জেরা করবে। শম্ভুকে ভি লিয়ে গেল। কর্নিলসাব! আপনারা যান। জিমের জন্য ডর করবেন না। জিম বাঁধা আছে।'

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে নরবাহাদুর!'

সে নুড়িবিছানো রাস্তায় কর্নেলের সঙ্গ নিল। বলল, 'বলুন সার!'

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'তুমিই তো সিনহাসায়েবের ডেডবডি প্রথম দেখেছিলে?'

'জি সার!' সে উত্তেজিতভাবে বলল, 'জিম খুব চিল্লাচিল্লি করছিল। তখন আমার নিদ টুটে গেল। তো চোর এসেছে মনে করল আমি। জানালা দিয়ে দেখলাম, সিনহাসাব বাগানের দিকে চলে যাচ্ছেন। আমার কেমন ডর বাজল। তো—'

এইসময় পোর্টিকোর তলা থেকে লখিয়া—সম্ভবত লক্ষ্মী আসল নাম, বেরিয়ে এসে মৃদুস্বরে বলল, 'মেমসায়েব ওপরে পাঠিয়ে দিতে বললেন।'

কর্নেল নরবাহাদুরকে বললেন, 'তাহলে তোমার সন্দেহ হয়েছিল?'

'হাঁ সার! ওই দেখুন লাল ফুলের জঙ্গল। তার পাশে উনহির ডেডবডি ছিল।'

'ঠিক আছে। তুমি কনস্টেবলদের খৈনি খাওয়াও গিয়ে।'

নরবাহাদুর চলে গেল। আমরা লখিয়াকে অনুসরণ করলাম। এতক্ষণে কোথাও কুকুরের চ্যাঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। লখিয়া তার উদ্দেশে ধমক দিতে দিতে সিঁড়িতে উঠে বলল, 'চলে আসুন আপনারা।' তারপর সে লাফ দিতে দিতে ধাপ ডিঙিয়ে ওপরে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, 'আশ্চর্য!'

কী আশ্চর্য, প্রশ্ন করে তার জবাব পেলাম না।...

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—বলো!'

'চিত্রা দত্ত যতবার এ বাড়িতে এসেছে, সঙ্গে একটা মেয়েকে দেখেছি। চিত্রা নিজে গাড়ি চালিয়ে আসত। মেয়েটি পোর্টিকোর নিচে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। চিত্রার সঙ্গে আমি প্রথম থেকেই ততকিছু কথাবার্তা বলতাম না। এ ঘরে প্রদীপের সঙ্গে বসে সে কথা বলত। আমি—হ্যাঁ, স্বীকার করছি, আড়ি পেতেছি। আড়ি পেতেই শুনেছিলাম প্রদীপ ওকে হাসতে হাসতে বলছে, তোমার বডিগার্ডকে এই ছবিতে একটা রোল দিলে মন্দ হয় না।'

কর্নেল গম্ভীর মুখেই বললেন, 'তার পবনে জিনস এবং মাথায় রুমাল জড়ানো থাকত?'

'হ্যাঁ।' মালবিকা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে বললেন, 'চিত্রাই প্রদীপকে মার্ডার করতে পাঠিয়েছিল ওকে।'

'কিন্তু মোটিভ কী থাকতে পারে?'

মালবিকা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'পুলিশও আমাকে এ কথা বলছিল। আমি জানি না প্রদীপের সঙ্গে চিত্রার সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল কি না। তবে—'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'তবে কী?'

'আমাদের সারভ্যান্ট বাচ্চু নাকি চিত্রা দত্তের বাড়িতে একসময় কাজ করত। তাকে পুলিশ জেরা করার জন্য থানায় নিয়ে গেছে।'

'বাচ্চু চিত্রা দত্তের বাড়িতে কাজ করেছিল এ কথা পুলিশ জানল কী ভাবে?'

'বাচ্চু লক্ষ্মীরানীকে কবে তা বলেছিল। লক্ষ্মীরানী মানে যে মেয়েটিকে দেখলেন।'

'শম্ভু নামে আরও একজনকেও তো পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে? নরবাহাদুর বলল।'

'হ্যাঁ। শম্ভু রাঁধুনি। প্রদীপের বাবার আমল থেকে এ বাড়িতে আছে। শম্ভু পুলিশকে বলেছে, জিমের চিৎকারে সে নিচের ঘর থেকে জানালায় উঁকি দিয়েছিল। তারপর সে নাকি বাচ্চুর মতো কাকে আবছা দেখতে পায়। বাগানের খানিকটা জায়গায় আলো পড়ে। কিন্তু গাছের ছায়া—তাছাড়া বৃষ্টি পড়ছিল। ঝোড়ো বাতাস বইছিল।' মালবিকা শ্বাস ছেড়ে ফের বললেন, 'শম্ভু সম্ভবত চিত্রার সেই বডিগার্ডকে দেখে বাচ্চু বলে ভুল করেছিল। কিন্তু পুলিশ ওকে আরও জেরা করবে।'

'বাচ্চু বা শম্ভু কেউ গুলির শব্দ শোনেনি?'

'না। আমিও শুনতে পাইনি। আসলে মেঘ ডাকছিল মাঝে মাঝে।'

'তুমি গত রাতে বারোটা নাগাদ আমাকে ফোন করেছিলে!'

মালবিকা এবার জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'গত রাতে দশটা-সওয়া দশটায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কী একটা শব্দে—ঠিক জানি না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ইদানীং প্রদীপ সম্পর্কে আমার খুব অস্বস্তি আর আতঙ্ক হতো। তাই টেবিলল্যাম্প জ্বেলে দেখি, ও বিছানায় নেই। বাথরুমে গেছে ভাবলাম। কিন্তু আধঘণ্টা কেটে গেল। তারপর দেখি, দরজা ভেজানো আছে। তখন রাত প্রায় বারোটা। বেলের সুইচ টিপে নরবাহাদুরকে ডাকলাম। তারপর আপনাকে ফোন করলাম। কেন জানি না, সে-মুহূর্তে আপনার কথা আমার মনে পড়েছিল।'

মালবিকা একটু ঝুঁকে দুহাতে মুখ ঢাকলেন। কর্নেল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মালবিকা! তোমার কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। এখন তোমাকে মরিয়া হয়ে অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। মনে রেখো, তোমার স্বামীর অনেকগুলো কাজ-কারবার আছে। সেগুলোর আর্থিক অবস্থা তোমার জানা দরকার। আর একটা কথা। মিঃ সিনহার অ্যাটর্নি বা লইয়ার কে, তোমার জানার কথা। কে তিনি?'

'পাশের বাড়িতে থাকেন। এস. কে. মুখার্জি। ওঁর দারোয়ান ফাগুলালই সেই খুনী মেয়েটাকে একটা গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিল। মিঃ মুখার্জি গত রাত থেকে যাতায়াত করছেন। খুব হেল্পফুল মানুষ।'

'এখন উনি কোথায় আছেন জানো?'

'ডেডবডি মর্গ থেকে শ্মশানে নিয়ে যাবেন। প্রদীপের বন্ধুবান্ধব আর কর্মচারীরা এসেছিল। তারা সবাই মর্গে অপেক্ষা করছে। বারোটা নাগাদ বডি ডেলিভারি দেবে।'

'তোমার স্বামীর আত্মীয়স্বজন?'

'আত্মীয়স্বজন বলতে ওর এক বোন। সে একজন জার্মানকে বিয়ে করে ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকে। তার ঠিকানা আমি জানি না। প্রদীপ তার বোন সম্পর্কে কেন যেন উদাসীন ছিল।'

'কাগজপত্র খুঁজে দেখো। ঠিকানা পেয়ে যেতেও পারো। পেলে তাকে দুঃসংবাদটা দেওয়া তোমার কর্তব্য।'

বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। মালবিকা চোখের জল মুছে বললেন, 'কিন্তু পুলিশের ওপর আমার ভরসা কম। আমি আপনার সাহায্য চাই।'

'আমি তো আছি। দেখা যাক পুলিশ কী করে।' কর্নেল মালবিকার দিকে একটু তাকিয়ে থাকার পর ফের বললেন, 'তুমি চুপচাপ বিশ্রাম করো। ভেঙে

পড়লে চলবে না। আর—আমি আপাতত নিচে গিয়ে দেখি, কোথায় তোমার স্বামীর ডেডবডি পড়েছিল।'

'নরবাহাদুরকে বলুন। সে দেখিয়ে দেবে।'

নিচে লনের ধারে দাঁড়িয়ে কর্নেল নরবাহাদুরকে ডাকলেন। সে হন্তদন্ত এগিয়ে এল। 'বলুন কর্নিলসাব!'

'বাহাদুর! ঠিক কোথায় তোমার মালিকের ডেডবডি পড়েছিল দেখিয়ে দাও।'

নরবাহাদুর কর্নেলের দিকে একটু অবাক চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'আসুন!'

বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দেশি-বিদেশি উঁচু-নিচু অজস্র গাছ। ফাঁকা জায়গাগুলিতে মরশুমি ফুলের উজ্জ্বল ঝাঁক এতক্ষণে রোদ পেয়ে ঝলমল করছে। পেছনের পাঁচিলের দরজা এখন ভেতর থেকে আটকানো আছে। বাড়ি থেকে প্রায় মিটার ছ-সাত দূরে একটা ছাতিমগাছের তলায় এগিয়ে গেল নরবাহাদুর। গাছের তলায় সবখানে ঝরা পাতা পড়ে আছে। রাতের বৃষ্টিতে পাতাগুলি ভিজে চবচব করছে। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মালী কোথায় বাহাদুর?'

নরবাহাদুর বলল, 'সায়েব ক'দিন আগে মালীকে ভাগিয়ে দিয়েছেন। নতুন মালী খোঁজা হচ্ছে।'

'পুরনো মালীকে সায়েব ভাগিয়ে দিলেন কেন?'

'বহুৎ হারামি ছিল সার! লখিয়াকে খারাব কথা বলেছিল। রুপেয়ার লালচ দেখিয়েছিল।'

কর্নেল নিচের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। সম্ভবত কোনো সূত্র খুঁজছিলেন। শুধু বললেন, 'হুঁ!'

নরবাহাদুর সামনে ফাঁকা একটুকরো জায়গায় কেয়ারি করা ঘন রঙ্গনা ফুলের সারির কাছে গিয়ে বলল, 'এখানে সাব! এই দেখুন! ঘাসের ওপর কাত হয়ে পড়েছিলেন সায়েব। পুলিশ আমাকে পানি দিয়ে সাফা করতে বলল। তখন করলাম। লেকিন আভি খুনের দাগ দেখতে পাবেন। পানির পাইপ টেনে ফিব সাফা করতে হবে।'

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অস্বস্তিটা আবার আমাকে পেয়ে বসেছে। কর্নেল হাঁটু মুড়ে বসে ঘাস পরীক্ষা করছিলেন। নরবাহাদুর অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। সে জানে না কে এই 'কর্নিলসাব'।

কর্নেল ফাঁকা জায়গা থেকে আবার ছাতিমতলায় গেলেন। তারপর আবার হাঁটু মুড়ে বসে ভেজা আর পচা একরাশ পাতা একটা কাঠি দিয়ে সরিয়ে

কিছু দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার বলো বাহাদুর, তুমি কোথায় সায়েবকে আসতে দেখেছিলে?'

নরবাহাদুর ততক্ষণে আঁতকে উঠে চোখ বড়ো করেছে। সে বলে উঠল, 'এখানে ভি খুন গিরেছে?'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। তোমার সায়েবকে গুলি করার সময় তিনি রঙ্গনা ঝোপের আড়ালে লুকোতে চেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক, তুমি কোথায় ওঁকে প্রথম দেখতে পেয়েছিলে বলো!'

নরবাহাদুর কয়েক হাত তফাতে খিড়কির দিকে যাওয়ার সংকীর্ণ রাস্তায় গিয়ে বলল, 'এখানে সার! ওই দেখুন! আমার ঘরের জানালা থেকে নজর হবে। ওই দেখুন, দোতলার সানশেডের নিচে বাত্তি ভি আছে।'

হাত তিনেক চওড়া রাস্তাটা মোরাম বিছানো। সেখানে দাঁড়িয়ে কর্নেল বাড়ির নিচের তলার একটা জানালা দেখিয়ে বললেন, 'ও ঘরে কে থাকে?'

'শম্ভু থাকে সার!'

কর্নেল বাড়ির ওপরদিকে তাকালেন। আমিও মুখ তুলেছিলাম। সেই সময় চোখে পড়ল, লখিয়া একটা জানালা থেকে আমাদেব দেখছিল। চোখে চোখ পড়ামাত্র সরে গেল।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা লাইটাবে ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমার সায়েবের পরনে কী পোশাক ছিল বাহাদুর?'

'নাইট-ডিরেস ছিল।'

কর্নেল খিড়কির দরজা পর্যন্ত গিয়ে তারপর ফিরে এলেন। বললেন, 'ওই দরজা যে খোলা আছে, প্রথমে কে দেখেছিল?'

'পুলিশ আসল। তাবপর দেখল।'

'তোমরা কেউ লক্ষ্য করোনি?'

'না সার। তখন মালিককে দেখব না আর কুছু দেখব।'

কর্নেল হঠাৎ নরবাহাদুবের কাঁধে হাত রেখে চাপা স্বরে বললেন, 'তোমার সায়েবকে কে মার্ডার কবতে পারে বলে তোমাব মনে হয়?'

নেপালি দারোয়ানের মুখে প্রচণ্ড অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। সে বলল, 'আমি কেমন করে জানব সার? লেকিন ছ লম্বর বাড়ির দারোয়ানজি ফাগুলাল খুনীকে দেখেছিল।'

'বাহাদুর! তোমার সায়েবের কাছে সিনেমার মেয়েরা আসত, নিশ্চয় তুমি জানো?'

'হাঁ সার! বাচ্চু আমাকে ভি বলেছিল, এখন যে হিরোইন যানা-আনা

করে, বাচ্চু তার নোকরি করত। আমি বললাম, নোকরি ছোড় দিলে কেন? তো বাচ্চু বলল, আমাকে রাখল না তো কী করব? সার! সেই হিরোইন আমার মালিককে বলেছিল, বাচ্চুকে লিন। আমার আর নোকর দরকার নাই। তখন সিনহাসাব বাচ্চুকে লিয়ে লিল। আমি পুলিশকে বলেছি সার!'

কর্নেল শম্ভুর ঘরের সেই জানালার নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন। কী দেখলেন উনিই জানেন। তারপর পা বাড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা বাহাদুর, তোমার সায়েবের ক'খানা গাড়ি আছে?'

'দো কার আছে সার! মেমসাবের একটা আর উনহির একটা।'

'ড্রাইভার আছে?'

'মেমসাব নিজে ডেরাইভ করেন। সিনহাসাবের ডেরাইভার জগদীশ আছে। সে বড়ির সাথে শ্মশানে যাবে। সুবামে চলে গিয়েছে।'

'গাড়ির গ্যারাজ তো ওপাশে? পেছন ঘুরেও যাওয়া যায় দেখছি।'

'হাঁ সার।'

কর্নেল বাড়ির সামনে গিয়ে পোর্টিকোর তলায় দাঁড়ালেন। ওখান থেকে বাড়ির উত্তর দিকে গ্যারাজ ঘর দেখা যাচ্ছিল। গরাদ দেওয়া গেটে তালা আঁটা আছে। ভেতরে একটা সাদা আর একটা লাল রঙের গাড়ি দেখা যাচ্ছিল। নরবাহাদুর উদ্বিগ্ন মুখে কর্নেলের দিকে তাকিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, এই 'কর্নিলসাব' কেন এতসব খোঁজখবর নিচ্ছেন, সে বুঝতে পারছে না।

কর্নেল তার দিকে ঘুরে বললেন, 'ঠিক আছে। চলি বাহাদুর!'

নরবাহাদুর ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেল। নুড়ি বিছানো পথে আমাদের আগে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে সে গেট খুলে দিল। সশস্ত্র কনস্টেবলদ্বয় কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফুটপাতে গিয়ে কর্নেল বললেন, 'এখানে ট্যাক্সি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। চলো! ওই গলিটা দিয়ে বেরিয়ে একটা বড় রাস্তা পাব।'

রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের গলিতে ঢুকলাম। গলিটার দুধারে পাঁচিল এবং একটা করে বাড়ি। প্রতিটি বাড়িই যে বিত্তবানদের, তা স্পষ্ট। হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি সিনহাসায়েবের বাড়ির সিঁড়িতে ওঠার সময় আশ্চর্য বলছিলেন। তখন জবাব দেননি। এখন দিতে আপত্তি আছে?'

কর্নেল বললেন, 'তোমারও চোখে পড়া উচিত ছিল।'

'কী?'

'লখিয়া—মানে, লক্ষ্মীরানীকে।'

'কেন?'

'বাড়িতে অমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। অথচ সে নির্বিকার। তাছাড়া—' কর্নেল চুপ করে কিছুক্ষণ হেঁটে গেলেন। তারপর ফের বললেন, 'একটা আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে ফ্রক পরে থাকে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেললাম। 'আপনি তা-ও লক্ষ্য করেছেন!'

'বৃষ্টির পর আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। অথচ আজ সোয়েটার পরেনি। হাতাকাটা ফ্রক!'

'খ্রিস্টান মেয়ে হতে পারে।'

'নাহ্। খ্রিস্টান মেয়েরা ওধরনের ফ্রক পরে না। আর কপালে টিপও পরে না।'

'ঠিক আছে। আপনি ওকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন। এই তো?'

কর্নেল কোনো কথা বললেন না। বেশ কিছুদূর চলার পর একটা বড় রাস্তা পাওয়া গেল। একটা ট্যাক্সি যেতে যেতে যেন কর্নেলকে দেখেই গতি কমাল। আমরা ট্যাক্সিতে উঠলাম।

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে ডোরবেলের সুইচ টেপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল ষষ্ঠীচরণ। সে উদ্বিগ্ন মুখে আমাকে বলল, 'দাদাবাবুর গাড়ি কী হলো? জানলা দিয়ে দেখলাম বাবামশাইয়ের সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নামছেন। পথে অ্যাকসিডেং হয়েছে নাকি?'

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'গোয়েন্দাগিরি শিখে গেছিস তাহলে! জয়ন্তকে আজ গাড়ি নিয়ে আসতে দেখেছিলি। তাই না?'

ষষ্ঠীচরণ ভড়কে গিয়ে বলল, 'আজ্ঞে বাবামশাই, দাদাবাবু তো গাড়ি নিয়েই আসেন।'

কর্নেল তাঁর ইজিচেয়ারে বসে বললেন, 'হুঁ। তো জানালার ধারে কী করছিলি?'

ষষ্ঠী ব্যস্তভাবে বলল, 'লালবাজারের লাহিড়িসায়েব তিনবার ফোন করেছিলেন। বলছিলেন, ফিরলেই তোমার বাবামশাইকে ফোন করতে বলবে। তাই—'

কর্নেল হাসলেন। 'জয়ন্ত! ষষ্ঠীর কত উন্নতি হয়েছে দেখ। আর লালবাজারের লাহিড়িসায়েব বলে না। ফোং বলে না। তবে অ্যাকসিডেং বলল। ওটা ঠিক। অন্তত তোমার ক্ষেত্রে।' বলে উনি টেলিফোন ডায়াল করতে থাকলেন।

ষষ্ঠী গোমড়ামুখে চলে যাচ্ছিল। রিসিভার কানে লাগিয়ে কর্নেল বললেন, 'তোর দাদাবাবুর এ বেলা নেমন্তন্ন।'

'দাদাবাবু সকালবেলা এলেই ওনার জন্যে রান্না করি। এ কি কোনো নতুন কথা?' বলে ষষ্ঠী পর্দা তুলে ভেতরে অদৃশ্য হলো।

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ির ফোনের কথা শুনে আমার অস্বস্তিটা বেড়ে গিয়েছিল। কর্নেলের দিকে তাকালাম। ফোনে সাড়া পেয়ে উনি বললেন, 'অরিজিৎ? কী ব্যাপার?.....হ্যাঁ। গিয়েছিলাম।.....আসলে মিসেস সিনহার বাবা অশোক রায় আমার বন্ধু ছিলেন। তাই.....আই সি! আজকাল পলিটিক্যাল প্রেশার তো সর্বত্র! যাই হোক, একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। যে গাড়িতে খুনী গিয়েছিল...' কর্নেল প্রায় অট্টহাসি হাসলেন। 'জয়ন্ত এখানেই আছে। তার সঙ্গে কথা বলতে পারো।...হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। গাড়ির নাম্বারটা ভুযো। দৈবাৎ জয়ন্তর গাড়ির নাম্বারের সঙ্গে মিলে গেছে।...দ্যাট্স্ রাইট। দেখার ভুলও হতে পারে। অত রাতে বৃষ্টির মধ্যে...শোনো! ফিল্মের মেয়েটির পলিটিক্যাল গার্জেন যখন চাপ দিচ্ছেন, তোমরা মেয়েটিকে বরং এড়িয়ে থাকো। আড়াল থেকে আমি কিন্তু আমার কাজ করে যাব। দেখো, তোমার লোকেরা যেন আমাকে বাধা না দেয়।...ও.কে.! ও.কে.! রাখছি।'

কর্নেল টেলিফোন রেখে আমার দিকে ঘুরে বসলেন। বললেন, 'তোমার ঝাঁড়া কেটে গেল। নাহ্ ডার্লিং! আমার জন্য নয়। ফিল্মস্টার চিত্রা দত্তের পলিটিক্যাল গার্জেনের নাম শুনেই পুলিশ এই কেসে তত খুঁটিয়ে তদন্ত করছে না। এতে আমার সুবিধেই হলো।'

বললাম, 'ছেড়ে দিন। ঝামেলায় জড়িয়ে কী লাভ?'

কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর থেকে রুমালে জড়ানো নোংরা সেই আগ্নেয়াস্ত্রটা বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর নির্বিকার মুখে বললেন, 'জড়াব না কী বলছ? এর চেয়ে অদ্ভুত রহস্য আর কী হতে পারে? গত রাতে একটি মেয়ে নিছক একটা টয় পিস্তলের নল তোমার কানের পাশে ঠেকিয়ে স্ট্রিফটন রোডে যেতে বাধ্য করল। আর—'

ওঁর কথার ওপর বলে উঠলাম, 'কী অদ্ভুত! ওটা সত্যিকার ফায়ার আর্মস নয়?'

'নাহ্। নিছক খেলনা পিস্তল।'...

।। চার ।।

খাওয়ার পর কর্নেল ড্রয়িং রুমে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। মুখে চুরুট। চোখ বন্ধ। আমি ডিভানে গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। আজ ভাতঘুমটা এলই না। যতবার ভাবছি, একটি মেয়ে নিছক খেলনার পিস্তল আমার কানের পাশে ঠেকিয়ে বৃষ্টিঝরা শীতের রাতে আমাকে ইচ্ছেমতো ক্লিফটন রোডে যেতে বাধ্য করেছে, ততবার নিজের ওপর খাপ্পা হচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে প্রশ্নটা আমার মাথায় এসে গেল। ডাকলাম, 'কর্নেল!'

'বলো!'

'চিত্রা দত্তের বডিগার্ড মেয়েটি প্রদীপ সিনহাকে খুন করেনি। টয় পিস্তলে কাকেও খুন করা যায় না!'

'হুঁ।'

'হুঁ নয়। আপনি ব্যাপারটা ভেবে দেখুন! আমার ধারণা, সে একটা নির্দিষ্ট সময়ে—ধরা যাক, রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে মিঃ সিনহার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নিশ্চয় দেখা করার কোনো বিশেষ কারণ ছিল। তাছাড়া মিঃ সিনহাই সম্ভবত খিড়কির দরজা খুলে রেখেছিলেন তার জন্য।'

'তোমার ধারণায় যুক্তি আছে।' কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে টয় পিস্তলটা ফেলে দিয়ে গেল কেন? না—ঠিক ফেলে দেওয়া বললে ভুল হবে। টয় পিস্তলটা এমন অবস্থায় ছিল, যেন কেউ ওটা তাড়াহুড়ো করে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।'

বলে কর্নেল দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেললেন। তারপর হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। কয়েকবার ডায়াল করার পর বিরক্ত মুখে বললেন, 'এই লাইনটা কিছুতেই পাওয়া যায় না। রিং হয়ে আবার তখনই এনগেজড্ টোন। গোপালবাবুকে পেলে সুবিধে হতো।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে গোপালবাবু?'

'জয়শ্রী স্টুডিয়োর ম্যানেজার।'

'সিনেমা স্টুডিয়ো? আপনি কি হিরোইন চিত্রা দত্তের ব্যাপারে—'

টেলিফোন বেজে উঠল আমার কথার ওপর। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া

দিলেন। 'হ্যাঁ, বলছি। বলো কী ব্যাপার?...লুনা এসকর্ট সার্ভিস থেকে?...হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু নামটা বলেনি?...ঠিক আছে। আমি যাব'খন। তুমি আপাতত বাড়ি থেকে বেরিয়ো না। ...না, না। সেজন্য নয়। বাড়ির সবকিছুতে তোমার নজর রাখা দরকার। বাড়ির লোকেদের ওপরও।...হ্যাঁ। ঠিক আছে। ছাড়ছি।'

টেলিফোন রেখে কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। বললাম, 'মিসেস সিনহা?'

'হ্যাঁ। লুনা এসকর্ট সার্ভিস নামে একটা সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে মালবিকাকে ফোন করেছিল। ব্যাপারটা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে।' বলে কর্নেল ফোন গাইডের পাতা ওল্টাতে থাকলেন।

বললাম, 'ব্যাপারটা কী?'

'ওরা জানতে চাইছিল, চিত্রা দত্ত ওখানে আছেন কি না।' কর্নেল ফোন গাইডের একটা পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে বললেন। 'চিত্রা দত্ত ওদের একজন লোক নিয়েছিলেন—লোক বলছিল, পুরুষ না মেয়ে, তা বলেনি—যাই হোক, সেই লোক ওদের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না এবং সেটাই নাকি ওদের নিয়ম।'

'ওরা জানে না প্রদীপ সিনহা খুন হয়েছেন?'

'মালবিকার ধারণা, ওরা এ খবরটা জানে না। মালবিকাও বলেনি। কালকের সব কাগজে অবশ্য খবর বেরিয়ে যাবে। কোনো সান্ধ্য দৈনিকে আজই বেরিয়ে যেতে পারে। আর—চিত্রা দত্তের সঙ্গেও ওরা যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিল। চিত্রার ফ্ল্যাটে তালা আঁটা। ফোনেও কেউ সাড়া দেয়নি।' কর্নেলের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতস কাচ বের করে বললেন, 'ফোন গাইডের অক্ষর পড়া এক ঝকমারি। আমার অবশ্য বয়স হয়েছে। তবু রিডিং গ্লাসের দরকার হয় না।'

বললাম, 'তাহলে লুনা এসকর্ট সার্ভিস খুব উদ্বিগ্ন?'

'হওয়ারই কথা।' কর্নেল টেবিল ল্যাম্পও জ্বেলে দিলেন। 'হ্যাঁ। লুনা এসকর্ট—লুনা শব্দটা অস্পষ্ট। এগারো বাই ওয়ান বাই সি পার্ক লেন।' বলে উনি টেবিল থেকে একটা খুদে প্যাড টেনে নিয়ে ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা টুকে নিলেন।

এতক্ষণে একটু উত্তেজনা অনুভব করলাম। বললাম, 'চিত্রা দত্তের বডিগার্ড বেগতিক বুঝে তার সঙ্গেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে।'

কর্নেল টেলিফোন ডায়াল করছিলেন। সাড়া পেয়ে বললেন, 'লুনা?...শুনুন! আমি জয়শ্রী স্টুডিয়ো থেকে বলছি। মিস দত্ত—মানে চিত্রা দত্ত আপনাদের জানাতে বলেছেন, ওঁকে যে বডিগার্ড আপনারা দিয়েছিলেন...হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুক্লা

দাশ...আগে শুনুন। শুক্লাকে মিস দত্ত গত রাত থেকে খুঁজে পাচ্ছেন না।...মিস দত্তের শূটিং ছিল আউটডোরে। তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মিস দত্ত আজও আউটডোরে আছেন। আমাকে টেলিফোনে বললেন...কী যেন জায়গাটার নাম—কো-কো—কোকরাঝাড় না কি... ছাড়ছি। আমার দায়িত্ব পালন করলাম।'

টেলিফোন রেখে টেবিল ল্যাম্পের সুইচ অফ করে কর্নেল হাসলেন। তারপর ঘড়ি দেখে হাঁক দিলেন, 'ষষ্ঠী! বেরুব। কফি খাইয়ে দে বাবা!'

বললাম, 'মেয়েটির নাম শুক্লা দাশ?'

'হ্যাঃ! তুমি রাতের আলোয় শুক্লা না কৃষ্ণা দেখেছিলে?'

'খুব একটা ফর্সা নয়। আসলে খুঁটিয়ে যে দেখব, মুখ ঘোরাতে দিলে তো? মুখ ঘোরাতে গেলেই টয় পিস্তলের নলের খোঁচা!'

'টয় পিস্তল বোলো না! তখন ওটা তোমার কাছে সত্যিকার ফায়ার আর্মস!'

হেসে ফেললাম। 'ওঃ! কী বিচ্ছিরি অপমান! রাতবিরেতে কোনো একলা মেয়েকে গাড়িতে লিফ্‌ট্‌ দিতে নেই। অথচ আমি কী বোকার মতো—'

'না জয়ন্ত! তুমি অ্যাডভেঞ্চারের ঝুঁকি নিয়েছিলে বলো!'

আমরা ঘটনাটা নিয়ে হাসি-পরিহাস চালিয়ে যেতে যেতে ষষ্ঠীচরণের কফি এসে গেল। তখন প্রায় পৌনে তিনটে বাজে।

বেরুতে তিনটে বেজে গেল। নিচের লনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'টালিগঞ্জ এলাকায়।'

'জয়শ্রী স্টুডিয়োতে নাকি?'

'হ্যাঁ। গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। শীত চলে যাবার সময় হঠাৎ ঘুরে এসে কলকাতাকে জাপটে ধরেছে। এতে যেন বেজায় সাড়া পড়ে গেছে। মাঝে মাঝে ট্রাফিক জ্যাম সম্ভবত তারই কারণ। জয়শ্রী স্টুডিয়োর গেটে যখন নামলাম, তখন পৌনে চারটে বেজে গেছে।

গেট বন্ধ। কিন্তু পাশের একটা ঘরের দরজা খোলা। কর্নেল সেই ঘরের সামনে গেলেন। দেখলাম, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসে দু হাতে চায়ের কাপ আঁকড়ে ধরে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর পরনে ছাইরঙা সোয়েটার। মাথায় কাঁচাপাকা একরাশ চুল এলোমেলো হয়ে আছে। কর্নেলকে প্রথমে তিনি দেখতে পাননি। চোখ ছিল টেবিলের দিকে। তারপর মুখ তুলে কর্নেলকে দেখেই নড়ে বসলেন। 'কী সর্বনাশ! কর্নেলসায়েব যে!'

'সর্বনাশ কিসের গোপালবাবু?'

গোপালবাবু খিকখিক করে হেসে বললেন, 'বসুন! বসুন! ঠিক আপনার কথাই ভাবছিলাম একটু আগে।'

কর্নেল বসলেন। পাশের চেয়ারে আমিও বসলাম। কর্নেল বললেন, 'আমিও আপনার কথা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত এসে পড়লাম। আলাপ করিয়ে দিই।'

'বুঝে গেছি। দৈনিক সত্যসেবক তো? কী মশাই? ঠিক চিনেছি কি না?'

'চিনেছেন তাহলে?'

'জয়ন্তবাবুকে চিনতে হবে? জয়ন্তবাবুর হয়তো স্মরণ নেই। গত বছর মার্চে কর্নেলসায়েবের বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। ফিল্মস্টার অতনুকুমারের মার্ডারকেসের ব্যাপারে—' বলে গোপালবাবু কর্নেলের দিকে তাকালেন। চাপা স্বরে বললেন, 'প্রদীপ সিনহার মার্ডারকেস হাতে নিয়েছেন তো? ঘণ্টা দেড়-দুয়েক আগে কেওড়াতলা থেকে ফিরেছি। ফিল্মলাইনের অনেকে গিয়েছিল শ্মশানে। সত্যি কথা বলতে কী, জয়শ্রী স্টুডিয়োকে সিনহাসায়েবই চাঙ্গা করে তুলেছিলেন। আগের ছবি ফ্লপ। তা সত্ত্বেও—আসলে অতবড় বিজনেস ম্যাগনেট। বিশ-পঞ্চাশ লাখ কোনো ব্যাপারই নয়। যাক গে। ও রতন! কোথা গেলি রে? অনারেবল গেস্টদের জন্য চা নিয়ে আয়।'

কর্নেল বললেন, 'চা খাব না গোপালবাবু!'

'সরি! আপনি কফি খান।'

'নাহ্। কফি খেয়েই বেরিয়েছি। ফোনে আপনাকে ধরার অনেক চেষ্টা করেও পেলাম না।'

গোপালবাবু টেবিলের ওপর ঝুঁকে এসে চাপা স্বরে বললেন, 'আমি কো-অপারেট করব। বলুন, কী জানতে চান?'

'চিত্রা দত্ত নামে একজন নতুন নায়িকা—'

কর্নেলের কথার ওপর গোপালবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। সিনহাসায়েবের সুনজরে পড়েছিল।'

'কিন্তু এই অভিনেত্রী সঙ্গে কেন বডিগার্ড নিয়ে ঘোরে, জানেন?'

'হুঁউ। জানি। আমাকে এসব খবর রাখতে হয়। মানে, খবর পেয়ে যাই। এই লাইনে অনেকেই অনেকের হাঁড়ির খবর রাখে। সবটাই যে পুরোপুরি সত্যি, তা নয়। তবে হ্যাঁ—কিছুটা সত্যি তো বটেই।' গোপালবাবু গলার স্বর আরও চাপা করলেন। 'সিনহাসায়েবের মৃত্যুর খবর পেয়েই স্টুডিয়ো বন্ধ। যাদের শুটিং ছিল, স্বেচ্ছায় বন্ধ করে চলে গেছেন। তো আপনি চিত্রার কথা জানতে চান? চিত্রার আসল নাম লতিকা। দমদম এরিয়ায়

বিয়ে হয়েছিল। তবে বিয়ের আগে থেকেই যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয় করত। তারপর কীভাবে ফিল্ম লাইনে এসে যায়। এই অংশটুকু আমার জানা নেই। শুধু জানি, তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। হাজব্যান্ড নাকি কোনো অফিসে চাকরি করে। তার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। তখন লতিকা ডিভোর্সের মামলা করেছিল। ডিভোর্স পেয়েও যায়। কিন্তু সেই লোকটা ওর পেছনে গুণ্ডা লাগায়। তাই শেষ অব্দি বডিগার্ডের ব্যবস্থা করে দেন সিনহাসায়েব।'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'আমি শুনেছি চিত্রার পেছনে কোনো প্রভাবশালী রাজনীতিক গার্জেন আছে। আপনি জানেন?'

'ওঃ হো!' গোপালবাবু হাসলেন। 'ফিল্মমহলে কয়েকটা ট্রেড ইউনিয়ন আছে। সেগুলো সাধারণ কর্মী আর টেকনিসিয়ানদের। একটা ইউনিয়নের এখন বেশ দাপট। হুঁ, সুমন হাজরা তার নাম। যাকে বলে জঙ্গি নেতা। গভ্‌মেন্টের ওপর মহলে সুমনবাবুর প্রভাব আছে। আমি জানি। তবে মজার কথা শুনুন। ক' মাস আগে জোর গুজব রটেছিল—তাছাড়া ফিল্ম ম্যাগাজিনেও বেরিয়েছিল, সুমনবাবু চিত্রাকে বিয়ে করছেন। আসলে চিত্রা ভীষণ—ভীষণ কেরিয়ারিস্ট টাইপের মেয়ে। খুব মেজাজি। একটুখানি নাম হতে না হতেই দর হাঁকতে শুরু করেছে। এদিকে সিনহাসায়েব খুন হয়ে গেলেন। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, চিত্রার হাজব্যান্ড ব্যাটাচ্ছেলেই খুন করেছে। এরপর ভগবান না করুন, চিত্রার বরাতে কী আছে কে জানে!'

'চিত্রাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

গোপালবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'পরশু একবার এসেছিল। শূটিং ছিল না। ডাইরেক্টর রানা গাঙ্গুলিব সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল দেখেছি। তারপর আর দেখিনি। আশ্চর্য! কেওড়াতলাতেও তো তাকে দেখলাম না! সর্বনাশ! লোকটা চিত্রাকেও মেরে গুম করে ফেলেনি তো? এই টেলিফোনটা দুদিন থেকে খারাপ। ওর ফ্ল্যাটে খোঁজ নেওয়া উচিত।'

'আমাকে ঠিকানাটা লিখে দিন গোপালবাবু!'

গোপালবাবু ড্রয়ার থেকে একটুকরো কাগজ বের করে ঠিকানা লিখে দিলেন। 'ফোন নাম্বারও দিলাম। এই নাম্বারটায় টিক মেরে দিয়েছি। এটা ওর প্রাইভেট নাম্বার। ফোন গাইডে পাবেন না।'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ গোপালবাবু! চলি। দরকার হলে যোগাযোগ করব।'

গোপালবাবু আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আপনারা গাড়িতে আসেননি?'

কর্নেল হাসলেন। 'আমার গাড়ি তো কবে বিক্রি করে দিয়েছি। জয়ন্তর গাড়ির অসুখ হয়ে গ্যারাজে আছে। আমরা ট্যাক্সি পেয়ে যাব।'

'এক মিনিট। আমি গাড়ি বের করতে বলি। আপনাদের পৌঁছে দেব। খামোকা বসে থাকার মানে হয় না।'

'আমরা হেস্টিংস এরিয়ায় যাব। মিঃ সিনহার বাড়ি।'

'তাতে কী হয়েছে? আপনাদের নামিয়ে দিয়েই যাব।'...

গোপালবাবু নিজে ড্রাইভ করেন না। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে মুখটা পেছনে ঘুরিয়ে কর্নেলের সঙ্গে সারাপথ অনর্গল কথা বলছিলেন। বুঝতে পারছিলাম ভদ্রলোক বড্ড বেশি বকবক করেন। বাংলা সিনেমার বর্তমান দুরবস্থা থেকে শুরু করে আগের আমলের সুখের স্মৃতিচর্চা এবং তার ফাঁকে হঠাৎ করে উঠতি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে মুখরোচক গল্পগাছা।

ক্লিফটন রোডে শীতসন্ধ্যার আলো-আঁধারি পরিবেশে অবশেষে কর্নেলের নির্দেশে গোপালবাবুর গাড়ি দাঁড়াল। গোপালবাবু বললেন, 'সিনহাসায়েবের বাড়িতে কখনও আসিনি। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে একটা পার্টিতে আলাপ হয়েছিল। ওঁকে সান্ত্বনা জানিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না। পরে টেলিফোনে কথা বলব বরং।'

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। কর্নেল বললেন, 'ধন্যবাদ গোপালবাবু!'

'না, না, কর্নেলসায়েব! ধন্যবাদ কিসের? এ তো আমার সৌভাগ্য।'

গোপালবাবুর অ্যাম্বাসাডার গাড়ি বাঁকের মুখে উধাও হয়ে গেল। প্রথমে কিছুক্ষণ চিনতে পারছিলাম না কোথায় নেমেছি। কর্নেল রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের ফুটপাতে গিয়ে বললেন, 'গোপালবাবু সব কথা রঙ চড়িয়েই বলেন। তা থেকে প্লাস-মাইনাস করে যেটুকু দাঁড়ায়, সেটুকু অবশ্য কাজে লাগানো চলে।'

বললাম, 'রহস্যটা এবার ভীষণ প্যাঁচালো হয়ে গেল যেন।'

কর্নেল শুধু 'হুঁ' বলে পাশের গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাড়িটা এবার চিনতে পারলাম। কর্নেল উঁকি মেরে দেখে বললেন, 'পুলিশ পাহারা দেখছি না।' তারপর ডাকলেন, 'বাহাদুর! বাহাদুর!'

বাহাদুর এগিয়ে এল পোর্টিকোর দিক থেকে। কর্নেলকে দেখে সে সেলাম ঠুকে গেটের তালা খুলে দিল। আমরা ঢুকলে সে আবার তালাটা এঁটে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বাচ্চুকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। শম্ভুকে ভি ছেড়ে দিয়েছে। তারপরে বাচ্চু শম্ভুর সঙ্গে ঝামেলা করছিল। আমি রুখে দিলাম। বাচ্চু শম্ভুকে মারতে যাচ্ছিল।'

বাড়িটা এখন সকালের মতো স্তব্ধ। নরবাহাদুর ডাকছিল, 'লখিয়া! লখিয়া!'

পোর্টিকোর ছাদে লক্ষ্মীরানীকে দেখা গেল। আবছা আলোয় দেখলাম তার গায়ে একটা চাদর জড়ানো আছে। বাহাদুর 'কর্নিলসাবের' খবর দিলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নরবাহাদুর আমাদের নিচের হলঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে যাওয়ার পর সিঁড়ির ওপর থেকে লখিয়া বলল, 'মেমসায়েব আপনাদের আসতে বললেন।'

আমরা দোতলায় সেই ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম। একটু পরে মালবিকা এলেন। মনে হলো, ঘটনার আঘাত অনেকটা সামলে নিয়েছেন। কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য থমথম করছে। আস্তে বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে লুনা এসকর্ট থেকে আবার কেউ ফোন করে জানতে চাইছিল, চিত্রা দত্ত এসেছেন কি না। আসেনি বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম।'

কর্নেল বললেন, 'চিত্রার বডিগার্ডের নাম জানতে পেরেছি। শুক্লা দাশ।'

মালবিকার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আপনি পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'এখনও জানাইনি।'

'তাহলে আমি জানিয়ে দিচ্ছি।'

'না। দরকার হলে আমি জানাব।'

মালবিকা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মিঃ মুখার্জি একটু আগে এসেছিলেন। উনি বলছিলেন, ওঁর ধারণা, পুলিশ কেন যেন আর তত আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আমি ওঁকে আপনার কথা বললাম। পুলিশের ওপর মহলে আপনার প্রভাব আছে, তাও বললাম। মিঃ মুখার্জি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। ওঁকে খবর দিচ্ছি।'

কর্নেল হাত তুলে বললেন, 'একটু পরে। আগে একটা কথা জানতে চাই।'

'বলুন!'

'তুমি নিশ্চয় জানো বাচ্চু চিত্রা দত্তের বাড়িতে কাজ করত।'

'জানি। আমি ওই রাফিয়ানটাকে সহ্য করতে পারি না। ওকে কালই ছাড়িয়ে দেব। আজ থানা থেকে ছাড়া পেয়ে এসে শম্ভুকে ও মারতে যাচ্ছিল। আমি বাহাদুরকে বলেছিলাম তখনই ওকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে।'

'লক্ষ্মীকে পেলে কীভাবে?'

মালবিকা আস্তে বললেন, 'বাচ্চু এনে দিয়েছিল। লক্ষ্মী ওর পিসতুতো না মাসতুতো বোন। তবে মেয়েটি ভালো। বিশ্বাসী। ওর সরলতা—আমি বলতে চাইছি ইনোসেন্স্ মাঝে মাঝে ওর বিপদ ডেকে আনে। আমাদের পুরনো মালী নবকান্তকে ওর জন্য বাধ্য হয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

কর্নেল হাসলেন। 'লক্ষ্মীর বয়স, আমার ধারণা, আঠারো-উনিশ বছর! অথচ—'

মালবিকা দ্রুত বললেন, 'ওর মেন্টাল ম্যাচিওরিটি বয়সের তুলনায় কম। শাড়ি পরতে চায় না।'

'হ্যাঁ। সকালে দেখছিলাম হাতকাটা ফ্রক পরে আছে। ভোরবেলা থেকে আজ বেশ শীত পড়েছে। কিন্তু সোয়েটার গায়ে ছিল না। এখন অবশ্য চাদর জড়িয়েছে দেখলাম!'

মালবিকা একটু অবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'ওকে সেদিনই একটা নতুন সোয়েটার কিনে দিয়েছি। আগেরটা নবকান্তের টানাটানিতে—দ্যাটস আ ন্যাস্টি অ্যাফেয়ার! নতুন সোয়েটারটা গত রাতের ঘটনার সময় নিচের বাগানে পা হড়কে পড়ে নোংরা করে ফেলেছিল। কেচে শুকোতে দিয়েছিল। এখনও নাকি শুকোয়নি। তাই ওকে একটা চাদর দিয়েছি।'

'লক্ষ্মী কোন ঘরে থাকে?'

'আগে নিচের তলায় কিচেনের পাশে একটা ঘরে থাকত। পরে ওকে দোতলায় পেছনদিকের একটি ঘর দিয়েছি।'

এইসময় লক্ষ্মী কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে এল ট্রেতে। তারপর কর্নেলের দিকে ওবেলার মতোই কেমন চোখে তাকাতে-তাকাতে বেরিয়ে গেল।

মালবিকা বললেন, 'মিঃ মুখার্জিকে ডাকি এবার!'

'একটু পরে।' কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তোমাদের খিড়কির দরজায় নিশ্চয় তালা আঁটা থাকে?'

'হয়তো থাকে। থাকারই কথা। আমি লক্ষ্য করিনি।'

'ওবেলা এসে আমি তালা দেখতে পাইনি। কিন্তু খুনী তো ওই দরজা দিয়েই ঢুকেছিল!'

'তাহলে পুলিশ তালাটা নিয়ে গেছে। মিঃ মুখার্জি বলতে পারবেন।'

'তোমার কি মনে হয়নি তোমার স্বামীই ওই দরজা খুলে খুনীকে বাড়ি ঢুকিয়েছিলেন?'

মালবিকা মুখ নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল বৈকি। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। প্রদীপের কাজকর্মের অনেক কিছু আমি জানি না। জানবার চেষ্টাও করিনি।'

'তুমি এখনই বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করো, খিড়কির দরজায় তালা এঁটেছে কি না।'

মালবিকা ডাকলেন, 'লক্ষ্মী!'

মেয়েটি তক্ষুণি ঘরে ঢুকে বলল, 'মেমসায়েব!'

'নিচে গিয়ে বাহাদুরকে বল্, পেছনের দরজায় তালা না দিয়ে থাকলে এখনই যেন তালা দেওয়ার ব্যবস্থা করে।'

লক্ষ্মী বলল, 'বাহাদুর দুপুরে নতুন তালা এনে লাগিয়েছে।'

'তুই দেখেছিস?'

'না দেখলে মিছিমিছি বলছি নাকি!' বলে লক্ষ্মী মুখটা করুণ করে ফেলল। 'মেমসায়েব! কাল একবেলার জন্য বাড়ি যাব। আবার মনে করিয়ে দিলাম।'

'ঠিক আছে। যাবি। বলেছি তো!'

লক্ষ্মী চলে গেলে কর্নেল বললেন, 'মিঃ মুখার্জিকে তুমি বরং টেলিফোনে জানিয়ে দাও, আমি ওঁর কাছে যাচ্ছি। ওঁকে কষ্ট করে আসতে হবে না। আমার একটু তাড়া আছে।'

মালবিকা হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। তারপর সাড়া পেয়ে মৃদু স্বরে কিছু বললেন। আমরা একটু তফাতে বসে ছিলাম। তাই কথাগুলি শুনতে পেলাম না। টেলিফোন রেখে মালবিকা বললেন, 'আপনার কথা ওঁকে বলেছি। উনি আপনাকে কিছু কথা বলতে চান!'

কর্নেল ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। মালবিকাকে সাবধানে থাকতে বলে বেরিয়ে এলেন। সিঁড়িতে নামবার সময় বললাম, 'কুকুরটা চুপ করে আছে কেন?'

কর্নেল বললেন, 'কুকুরের কথা পরে। চলো, মিঃ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করা যাক।'

নরবাহাদুর গেট খুলে দিল। আমরা বেরিয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ কর্নেল ডাকলেন, 'বাহাদুর!'

'বোলিয়ে কর্নিলসাব!'

'পেছনের দরজায় কি তুমি নতুন তালা এঁটে দিয়েছ?'

'হাঁ সাব!'

'আচ্ছা বাহাদুর, লখিয়ার সোয়েটারে নাকি গতরাতে কাদা মেখে গিয়েছিল। তাই সে ওটা কেচে নাকি শুকোতে দিয়েছিল। তুমি কি শুকোতে দেওয়া সোয়েটারটা দেখেছ?'

নরবাহাদুর অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'লাল রঙের সোয়েটার। লেকিন—হাঁ, হাঁ! লখিয়া বলছিল, সোয়েটারে বহৎ ময়লা লেগেছে। ধুলেও সাফা হবে না। তো আমি বললাম, এক নয়া সোয়েটার মাঙ্ লো। মেমসাবকো বোলো।'

'তাহলে তুমি সোয়েটারটা শুকোতে দেখনি?'

নেপালি দারোয়ান হাসল। 'কোথায় শুখা করবে? বাড়িতে এখন যা ধুপ পড়ে, তা গেরিজঘরের সামনে। শুখা করতে দিলে তো আমি দেখব? বহৎ ফন্দিওয়ালি আছে লখিয়া। মেমসাবের কাছে নতুন সোয়েটার লিবে।'

কর্নেল সংকীর্ণ ফুটপাতে হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। লক্ষ্মীরানীর সোয়েটার নিয়ে ওঁর এত মাথাব্যথার কারণ কী বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ কর্নেল সেই সরু কানাগলিতে ঢুকে আস্তে বললেন, 'চুপচাপ এস। এমনভাবে পা ফেলবে যেন কেউ শুনতে না পায়।'

ওঁর মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে তারপর বাঁ দিকে ঘোরার সময় কর্নেল পকেট থেকে খুদে টর্চ বের করে পায়ের কাছে আলো ফেললেন। ফিসফিস করে বললেন, 'ওবেলা এসে বটগাছের শেকড়ের ফাঁকে একটুখানি চোখে

পড়েছিল। তখন ভেবেছিলাম একটুকরো লাল রঙের ন্যাকড়া। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি আসছি।'

লক্ষ্য করলাম, উনি পাঁচিলের ধারে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছেন। একটু পরে ওঁর টর্চের আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। তারপর তেমনি ভঙ্গিতে ফিরে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'চলো। কেটে পড়া যাক।'

ছিঁচকে চোরের ভঙ্গিতে দুজনে গলি থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে পৌঁছুলাম। তারপর কর্নেল বললেন, 'মিঃ মুখার্জির বাড়িতে এখন যাচ্ছি না। চলো, সেই গলি দিয়ে বড় রাস্তায় যাওয়া যাক।'

উল্টোদিকের নির্জন গলিতে ঢুকে বললাম, 'লক্ষ্মীর ফেলে দেওয়া সোয়েটার কুড়িয়ে আনলেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ওতে কী এমন ইমপর্ট্যান্ট পয়েন্ট আছে বলে আশা করছেন?'

কর্নেল হাসলেন। 'যখের ধন বলতে পারো। বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখব'খন।'

এতক্ষণে দেখতে পেলাম ওঁর হাতে একটা কালো রঙের মোটাসোটা প্ল্যাস্টিক প্যাকেট ঝুলছে এবং ওপরের দিকে লাল রঙের সোয়েটারের একটুখানি অংশ বেরিয়ে আছে।

ট্যাক্সি চেপে ইলিয়ট রোডে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে সাড়ে ছটা বেজে গেল। ষষ্ঠীচরণকে কড়া কফির হুকুম দিয়ে কর্নেল প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট থেকে সাবধানে যেমন-তেমনভাবে ভাঁজ করে ঢোকানো লাল ফুলহাতা সোয়েটারটা বের করলেন। তারপর সোয়েটারের ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একশো টাকার নোটের পাঁচটা বাণ্ডিল। প্রতিটি বাণ্ডিলে ক্লিপ আঁটা এবং ব্যাঙ্কের ছাপানো স্লিপ সাঁটা আছে। দেখামাত্র বলে উঠলাম, 'পঞ্চাশ হাজার টাকা!'

কর্নেল ব্যাঙ্কের নাম দেখে নিয়ে দ্রুত টেবিলের ড্রয়ারে নোটের বাণ্ডিলগুলো ঢোকালেন। তারপর সোয়েটারটা আগের মতো কালো প্ল্যাস্টিকের থলের ভেতর ঠেসে দিলেন।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। এবার বললাম, 'আপনি কীভাবে জানলেন—'

'খানিকটা অনুমান, খানিকটা অঙ্ক ডার্লিং!' কর্নেল সকৌতুকে হেসে উঠলেন। 'চোরের ওপর বাটপাড়ি! টাকাগুলোয় পচা পাতা আর জলকাদার ছোপ লেগে আছে। তার মানে, মিঃ সিনহার হাত থেকে ওগুলো ছিটকে পড়েছিল। যাই হোক, পঞ্চাশ হাজার টাকা কম কথা নয়। কেন এত টাকা সিনহাসায়েব শুক্লাকে দিতে গিয়েছিলেন, এটাই আপাতত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শোনো! তুমি এই যখের ধন পাহারা দাও। কফি খেয়ে আমি একা বেরুব। আমি না ফেরা পর্যন্ত যেন কিছুতেই এখান থেকে নড়ো না। যত রাত হোক, তুমি থাকবে। সুযোগ পেলে ফোন করব।'

এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।...

।। পাঁচ ।।

কর্নেল সেই কালো প্ল্যাস্টিকের থলেতে ঠেসে ভরা লাল সোয়েটারটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা সেই কানাগলিতে বটগাছের শেকড়ের তলায় আগের মতো রাখতে যাচ্ছেন। কিন্তু শেষাবধি এতে মিঃ সিনহার হত্যারহস্য ফাঁস হওয়ার ব্যাপারে কী সাহায্য হবে, তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। বড়জোর লক্ষ্মীরানীর বাড়াভাতে ছাই পড়বে। গত রাতে প্রদীপ সিনহার মৃতদেহ নরবাহাদুর যখন আবিষ্কার করে, তখন স্বভাবত একটা হইচই পড়ে যায় এবং মেয়েটি দৈবাৎ টাকার বাণ্ডিলগুলো দেখতে পেয়ে আত্মসাৎ করে। তখন খিড়কির দিকটা খোলা ছিল। কাজেই সে একফাঁকে টাকাগুলো একটা কালো প্ল্যাস্টিকের থলে যোগাড় করে সোয়েটারের ভেতর ভরে বাইরে লুকিয়ে রেখে আসে। টাকার প্রতি লোভ তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তবে সে বয়সের তুলনায় মানসিকভাবে অপরিণত, মালবিকার এই ধারণা দেখা যাচ্ছে একেবারে ভুল।

কিন্তু এতে একটা খটকা থেকে যাচ্ছে। লক্ষ্মী সম্ভবত বোকা হবার ভান করে থাকত। কেন থাকত? তাছাড়া বাচ্চু তাকে মাসতুতো বা পিসতুতো বোন বলে ও বাড়িতে জুটিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ মনে হলো, অভিনেত্রী চিত্রা দত্তই কি কোনো উদ্দেশ্যে ওদের দুজনকে প্রদীপ সিনহার বাড়িতে ঢুকিয়েছিল?

নাহ্। যত ভাবব, তত মগজ গুলিয়ে যাবে। ঘড়ি দেখলাম। রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। ষষ্ঠী একবার এসে জেনে গেল কফি খাব কি না। তাকে কফির বদলে চা আনতে বললাম।

চা দিতে এসে ষষ্ঠীচরণ মুচকি হেসে বলল, 'রাত্তিরেও দাদাবাবুর নেমন্তন্ন।'

বললাম, 'না, না। আমাব বাড়ি ফিরতেই হবে। সেই সকালবেলায় বেরিয়েছি।'

'আপনি কাগজের লোক। এতকাল দেখে আসছি আপনাকে। তাছাড়া বাবামশাইয়ের পাল্লায় পড়লে তো কথাই নেই।'

এইসময় টেলিফোন বাজল। টেলিফোনের পাশেই বসে ছিলাম। রিসিভার তুলে সাড়া দিলাম। কণ্ঠস্বর চেনা মনে হলো। 'কর্নেলসায়েব আছেন নাকি?'

'আপনি কে বলছেন?'

'গোপাল কুণ্ডু। কর্নেলসায়েবকে দিন প্লিজ!'

'আপনি কি জয়শ্রী স্টুডিয়োর গোপালবাবু?'

'ঠিক ধরেছেন। তবে আমিও ধরেছি। আপনি জয়ন্তবাবু!'

গোপালবাবুর খিকখিক হাসির শব্দ ভেসে এল। বললাম, 'কর্নেল একটু জরুরি কাজে বেরিয়েছেন। কখন ফিরবেন বলে যাননি। ওঁকে কিছু বলতে হবে?'

'আপনাকে বললেও চলে।'

'তাহলে বলতে পারেন। কর্নেল না ফেরা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।'

'ওঁকে বলবেন, বিশ্বস্ত সূত্রে—মানে ভেরি ভেরি রিলায়েব্‌ল্ সোর্স বুঝলেন তো? সেই সোর্স থেকে এইমাত্র খবর পেলাম, চিত্রা দত্ত গত রাতে হোটেল ইন্টারন্যাশনালে ছিল। আজ মর্নিং ফ্লাইটে বোম্বে চলে গেছে। ওর বোম্বে যাওয়ার ব্যবস্থা নাকি আগেই করা ছিল। কিন্তু এর চেয়ে জব্বর খবর হলো, স্বয়ং সিনহাসায়েব—মানে প্রদীপ সিনহা ওকে নিজের গাড়িতে সন্ধ্যা ছটা নাগাদ হোটেল ইন্টারন্যাশনালে পৌঁছে দেন। আমার সোর্স প্রত্যক্ষদর্শী। চিত্রার বডিগার্ডও যথারীতি সঙ্গে ছিল।'

'চিত্রা দেবী তাহলে বডিগার্ডসহ বোম্বে গেছেন?'

'সেটা অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি। কর্নেলকে খবরটা দেবেন। উনি যদি এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে চান, আমি তা জানাবার চেষ্টা করব। আমার বাড়ির নাম্বার কর্নেল জানেন। রিং করতে বলবেন।'

'বলব। ধন্যবাদ গোপালবাবু!'

'আরে মশাই! এতে ধন্যবাদের কী আছে? আপনার মনে পড়া উচিত, ফিল্মস্টার অতনুকুমারকে মার্ডারের কেসে আমি যেভাবে ফেঁসে গিয়েছিলাম, কর্নেলসায়েব না থাকলে আমার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন জেল হতো। ওঃ! কর্নেলসায়েব এ যুগে এক ত্রাণকর্তা। তাঁর ঋণ কী দিয়ে শুধব বলুন?'

'আচ্ছা, রাখছি।'

মনে হলো, গোপালবাবু যেন একটু রসেবশে আছেন। কথাগুলো এলোমেলো না হলেও কিঞ্চিৎ জড়ানো। সম্ভবত হাতে পানপাত্র নিয়ে বসেছেন। তবে খবরটা গুরুত্বপূর্ণ। কাল সন্ধ্যায় প্রদীপ সিনহা চিত্রা দত্তকে হোটেলে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন এবং তখন চিত্রার বডিগার্ড শুক্লাও সঙ্গে ছিল।

কিন্তু সেই শুক্লা কেন রাত দশটায় আমার গাড়িতে জোর করে উঠে প্রদীপ সিনহার বাড়িতে গেল? নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল ওঁর সঙ্গে, সেটা স্পষ্ট। শুধু বোঝা যাচ্ছে না, সিনহাসায়েবকে কেউ গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে সে পেছনের গলিতে টয় পিস্তল ফেলে দিয়েছিল কেন?

ষষ্ঠী কখন ভেতরে গিয়েছিল। পর্দা তুলে বলল, 'ততক্ষণ টিভি দেখবেন তো আসুন দাদাবাবু!'

বললাম, 'না ষষ্ঠী। টিভি দেখতে আমার ভালো লাগে না। দল বেঁধে বাঁদরনাচ, নয় তো বাঘ-সিংহের মতো তুম্বো মুখের হাঁকডাক। কখনও ন্যাকা-নেকিদের আধো-আধো বুলি।'

ষষ্ঠী বাচ্চা ছেলের মতো হাসতে হাসতে অদৃশ্য হলো।

সাড়ে নটা বাজে। এখনও কর্নেলের পাত্তা নেই। একটা সিগারেট ধরাতেই হলো। সিগারেট ছাড়াব জন্য দু-তিনটের বেশি কিনি না। কিন্তু দিনে মোটমাট দু প্যাকেট কেনা হয়ে যায়। বিশেষ করে চিন্তাভাবনার সময়ে।

সিগারেটটা সবে শেষ করেছি, ডোরবেল বাজল। ষষ্ঠী টিভির সামনে বসে আছে। তাই উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। কর্নেল নন। একজন সাদাসিধে প্যান্ট-শার্ট এবং হাফহাতা সোয়েটার পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিনীতভাবে নমস্কার করে বললেন, 'আমি কর্নেলসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

বললাম, 'উনি বেরিয়েছেন। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'বিডন স্ট্রিট থেকে। আমার নাম তারকনাথ দাশ।' ভদ্রলোক করুণ মুখে বললেন, 'কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার। উনি কখন ফিরবেন?'

'কখন ফিরবেন বলে যাননি। কী দরকার তা আমাকে বলতে পারেন। উনি এলে বলব। আপনি বরং কাল সকালে আসবেন।'

'কাইন্ডলি আমাকে কর্নেলসায়েবের জন্য ওয়েট করতে দিন।'

ড্রয়িং রুমের ভেতর টেবিলের ড্রয়ারে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। তাছাড়া এখন একটা রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমি জড়িয়ে গেছি। এ মুহূর্তে কোনো অচেনা লোককে ঘরে ঢোকানো কি উচিত হবে? বললাম, 'আপনি নিচের লনে কিংবা গেটের কাছে ওয়েট করতে পারেন।'

কথাটা বলেই ভদ্রলোকের দাশ পদবিটা আমার মাথার ভেতর হঠাৎ খোঁচা দিল। উনি হতাশমুখে আমার দিকে তখনও তাকিয়ে আছেন। এবার বললাম, 'আপনার সঙ্গে কি কর্নেলসায়েবের পরিচয় আছে?'

তারকবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না। আমি জয়শ্রী স্টুডিয়োর গোপালবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ওঁর কাছ থেকে আসছি। উনিই কর্নেলসায়েবের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছেন। এই দেখুন।'

বলে উনি পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করলেন। বললাম, 'কিন্তু গোপালবাবু এই তো কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিলেন। আপনার কথা তো বললেন না!'

'উনি একটু খেয়ালি মানুষ। হয়তো ভুলে গেছেন। আপনি ওঁকে ফোন করে জেনে নিতে পারেন।'

'আমি ওঁর ফোন নাম্বার জানি না।' বলে তারকবাবুর দিকে তাকালাম 'আচ্ছা, ফিল্মস্টার চিত্রা দত্তের বডিগার্ড শুক্লা কি—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমারই ছোট মেয়ে। ছোটবেলা থেকে জুডো-ক্যারাটে—তাছাড় জিমন্যাস্টিক এ-সবেও ওর নেশা ছিল। স্কুল ফাইনাল পাশ করে কাজকম জোটাতে পারছিল না। শেষে একটা সিকিউরিটি এজেন্সিতে ঢুকেছিল। লুন এসকর্ট সার্ভিস। তা প্রায় বছর তিনেক ওখানে কাজ করছে। কিছুদিন থেকে ওকে ওই ফিল্মস্টারের বডিগার্ড করেছিল ওরা। পাশের ফ্ল্যাটে ফোন আছে কোনো রাতে বাড়ি না ফিরতে পারলে জানিয়ে দিত। কিন্তু কাল রাত থেকে কোনো খবর নেই। ওদের অফিসে গেলাম। ওঁরা বললেন, পুলিশকে জানানো হয়েছে। শুক্লা গত রাত থেকে রিপোর্ট করেনি। তখন ছুটে গেলাম গোপালবাবুর কাছে।' তারকবাবু রুমাল বের করে নাক মুছলেন। 'বড্ড ডানপিটে মেয়ে সাব! বাইশ বছর বয়স। ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট—'

ওঁর কথা থেমে গেল। মুখ ঘুরিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকালেন। উঁকি মেরে কর্নেলের টুপি দেখতে পেলাম। বললাম, 'কর্নেল এসে গেছেন!'

কর্নেল উঠে এসে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী ব্যাপার জয়ন্ত?'

'শুক্লা দাশের বাবা ইনি।'

কর্নেল তারকবাবুর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'হুঁ। আসুন! জয়ন্ত, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই। এঁকে এখানে দাঁড় করিয়ে কথা বলছ!'

কর্নেলের সঙ্গে আমরা ড্রয়িং রুমে ঢুকলাম। তারকবাবুকে বসতে বলে কর্নেল ভেতরে গেলেন। দেখলাম, তারকবাবু অবাক চোখে কর্নেলের জাদুঘর সদৃশ ড্রয়িং রুম দেখছেন। তাঁর নিখোঁজ মেয়ে যে গত রাতে আমার কানের পেছনটা লাল করে দিয়েছে, সেই কথাটা ওঁকে রাগের বশে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু রাগ চেপে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

কর্নেল পোশাক বদলে ফিরে এলেন। টুপি খুলে রাখার পর এখন ওঁর চওড়া টাক আলোয় ঝলমল করছিল। ইজিচেয়ারে বসে আস্তেসুস্থে চুরুট ধরিয়ে তারকবাবুকে বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন।'

তারকবাবু আমাকে বলা কথাগুলো আবার আওড়ালেন। কর্নেল সবটা শোনার পর বললেন, 'কিন্তু আপনি কি জানেন আপনার মেয়েকে পুলিশ খুঁজছে?'

তারকবাবু কথাটা না বুঝেই বললেন, 'আজ্ঞে, লুনা এসকর্ট সার্ভিস পুলিশে অলরেডি খবর দিয়েছে তো। তাই পুলিশ ওকে খুঁজছে।'

'না তারকবাবু! পুলিশ আপনার মেয়েকে অন্য কারণে খুঁজছে।'

'আজ্ঞে?'

'হেস্টিংস এরিয়ার একজন বড় ব্যবসায়ী এবং ফিল্ম প্রোডিউসার প্রদীপ সিনহাকে খুনের দায়ে শুক্লাকে পুলিশ খুঁজছে। গত রাতে শুক্লা মিঃ সিনহাকে গুলি করে মেরে পালিয়েছে।'

তারকবাবু নড়ে বসলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব সার! এ কখনো হতে পারে না। শুক্লা জুডো-ক্যারাটেতে এক্সপার্ট। কিন্তু মানুষ খুন? না, না। আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া সে বন্দুক-পিস্তল পাবে কোথায়? লুনা এসকর্ট সার্ভিস ওকে ফায়ার আর্মস দেয়নি। দিলে আমি জানতে পারতাম।'

'ফায়ার আর্মস সঙ্গে না থাকলে আপনার মেয়ে ফিল্মস্টার চিত্রা দত্তের বডিগার্ড হয়েছিল কোন সাহসে?'

'ক্যারাটেতে শুক্লা ব্ল্যাক বেল্ট হয়েছিল।'

'আপনি লুনা এসকর্ট সার্ভিসে গিয়ে জেনে নিন, ওরা তাকে ফায়ার আর্মস দিয়েছিল কি না।'

তারকবাবুকে এবার উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। বললেন, 'শুক্লার কাছে শুনেছি, লুনা কাউকে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কোথাও রাখলে লাইসেন্স করা বন্দুক দেয়। তবে লুনাতে শুক্লা বাদে সবাই পুরুষমানুষ। এক্স-সার্ভিসম্যান।'

কর্নেল চোখ বুজে হেলান দিলেন। জ্বলন্ত চুরুট কামড়ে ধরে বললেন, 'আপনি কী করেন?'

'আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে ছোটখাটো একটা চাকরি করি। জয়সোয়াল ট্রেডিং কোম্পানি। ব্র্যাবোর্ন রোডে অফিস।' তারকবাবু করজোড়ে বললেন, আমার মেয়েকে উদ্ধার করে দিন সার! আপনি পুলিশকে বুঝিয়ে বললে ওরা নিশ্চয় বুঝবে। শুক্লা কেন কাউকে খুন করবে?'

'ধরুন, চিত্রা দত্ত ওকে টাকার লোভ দেখিয়ে মিঃ সিনহাকে খুন করতে পাঠিয়েছিল?'

'এ কক্ষণো হতে পারে না। নিশ্চয় কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। শুক্লা সে-ধরনের মেয়ে নয় সার! লুনা ওকে মাসে মাত্র দু হাজার টাকা মাইনে দেয়। ইদানীং ফিল্মস্টারের বডিগার্ড হওয়ার পর তার কাছে মাঝে মাঝে বখশিস পেত। টাকার লোভ থাকলে তো—'

জোরে শ্বাস ছেড়ে তারকবাবু থেমে গেলেন। কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন!'

'আর বেশি কী বলব সার?' তারকবাবু রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন। চোখ মুছলেন। 'আমাব মেয়েকে আমি চিনি।'

'আপনি লুনা এসকর্ট সার্ভিসে ফোন করে জেনে নিন, ওরা আপনার মেয়েকে ফায়ার আর্মস দিয়েছিল কি না। আমি লাইন ধরে দিচ্ছি।'

কর্নেল টেবিলের ছোট্ট প্যাডে লিখে রাখা নাম্বার দেখে নিয়ে টেলিফোন ডায়াল করলেন। তারপর সাড়া পেয়ে বললেন, 'এখানে কথা বলুন।'

তারকবাবু উঠে এসে টেলিফোন ধরলেন। লক্ষ্য করলাম, ওঁর হাত কাঁপছে। বললেন, 'ইয়ে—আমি শুক্লার বাবা বলছি। সান্যালসায়েব আছেন? ওঁকে দিন।... নমস্কার সার! আমি শুক্লার বাবা...প্লিজ শুনুন! আপনারা শুক্লাকে কি ফায়ার আর্মস দিয়েছিলেন?...এ্যাঁ? কী বললেন সার?... ও! বুঝেছি।...কিন্তু এদিকে খারাপ খবর আছে সার! একটু আগে জানতে পারলাম, হেস্টিংস এরিয়ার একজন বিজনেসম্যানকে খুনের দায়ে পুলিশ শুক্লাকে ...আপনারা শুনেছেন? কিন্তু পুলিশকে বললেন না কেন শুক্লাকে টয় পিস্তল দিয়েছিলেন? খামোকা আমার মেয়ে...' বলে তারকবাবু কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। 'লাইন কেটে গেল। কিন্তু বুঝুন ব্যাপার! ওরা বলছে, শুক্লাকে ওরা খেলনার পিস্তল দিয়েছিল। যাত্রা থিয়েটারে যে পিস্তল ইউজ করা হয়।'

টেলিফোন রেখে তারকবাবু আগের জায়গায় গিয়ে বসলেন। কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, 'আপনার ঠিকানা রেখে যান। বাড়িতে ফোন থাকলে—'

'ফোন নেই সার। বরং অফিসেব ফোন নাম্বার লিখে দিচ্ছি।'

কর্নেলের প্যাডে নাম-ঠিকানা এবং অফিসেব ফোন নাম্বার লিখে দিলেন তারকবাবু। কর্নেল বললেন, 'আমি আপনার মেয়েকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে প্রয়োজন হলে আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এই কার্ডটা রাখুন।'

কার্ডটা আড়ষ্ট হাতে নিয়ে পকেটে ভরলেন তারকবাবু। তারপর আবার একদফা অনুরোধ জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এবার কর্নেলকে গোপালবাবুর দেওয়া খবরটা জানিয়ে দিলাম। কর্নেল চুপচাপ শোনার পর বললেন, 'হুঁ। ব্যাপারটা ক্রমশ আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তো এবার তোমার ধারণা কী, বলো জয়ন্ত!'

'আমার ধারণা সম্পর্কে আপনি কখনও সিরিয়াস নন। কারণ আমি বড্ড বোকা!'

কর্নেল হাসলেন। 'না ডার্লিং! সিরিয়াসলি বলছি। আমি আমার থিয়োরিটা একটু ঝালিয়ে নিতে চাই।'

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'গোপালবাবুর তথ্যের ভিত্তিতে আমার মনে হয়েছে, কাল বিকেলের মধ্যে এমন কিছু ঘটেছিল, যাতে চিত্রার বিপদ ঘটতে পারে ভেবে মিঃ সিনহা তাকে হোটেল ইন্টারন্যাশনালে রেখে আসেন। সম্ভবত তাকে আপাতত বোম্বে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করেন। কিন্তু সঙ্গে টাকা ছিল না বলে চিত্রার বিশ্বস্ত বডিগার্ড শুক্লাকে রাত এগারোটার মধ্যে তাঁর বাড়িতে গিয়ে টাকা আনতে বলেন।'

'বাহ্! তোমার ধারণায় যুক্তি আছে।' কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, 'কিন্তু শুক্লার সঙ্গে টয় পিস্তল ছিল। কাজেই তাকে খুনী বলাব যুক্তি ধোঁপে টেঁকে না।'

'হ্যাঁ! আমার ধারণা শুক্লা খুনী নয়। এমন হতে পাবে, হোটেলেই কেউ আড়ি পেতে সিনহাসায়েবের কথা শুনেছিল। সে আগেই এসে খিড়কিব দরজা খোলা পেয়ে বাগানের মধ্যে ওঁত পেতে বসে ছিল। চিন্তা করুন, তখন বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘ ডাকছিল। ঝোড়ো বাতাস বইছিল।'

'বলে যাও! বলে যাও!'

'শুক্লা ট্যাক্সি না পেয়ে আমাব গাড়িতে উঠে আমাকে ক্লিফটন রোডে যেতে বাধ্য করে। তারপর সে কথামতো খিড়কি দিয়ে ঢোকে। সিনহাসায়েব টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাকে টাকা দেওয়ার সময় ওঁত পেতে থাকা খুনী এসে গুলি করে সিনহাসায়েবকে। তাঁর হাত থেকে নোটের বাণ্ডিল পড়ে যায়। এবার খুনী শুক্লাকে তাড়া করে। হয়তো গুলি ফসকে গিয়েছিল। অথবা—এমনও হতে পারে, তার হাতে গুলি লেগেছিল। টয় পিস্তল ছিটকে পড়ে। আহত অবস্থায় সে পালিয়ে যায়।'

'কিন্তু টয় পিস্তলটা কুড়িয়ে পেয়েছি কানাগলিতে এবং বটগাছের প্রায় কাছাকাছি।'

'তাহলে শুক্লাকে তাড়া করে গিয়ে গলিতে খুনী দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়েছিল।'

'খুনীর কিন্তু টাকাগুলোর দিকে মন ছিল না। কারণ ওগুলো কুড়িয়ে পায় লক্ষ্মীরানী।'

আবার একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'তাহলে সিনহাসায়েবকে খুন করাই তার মোটিভ ছিল।'

'কেন?'

'কর্নেল! এমন কি হতে পারে না, চিত্রাকে নিয়ে সিনহাসায়েব এবং চিত্রার পলিটিক্যাল গার্জেন সুমন হাজরার মধ্যে রেষারেষি চলছিল?'

কর্নেল দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, 'হুঁউ। তা অস্বীকাব করা যায় না।'

উৎসাহে বললাম, 'সুমন হাজরা নিজে এমন ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না। সম্ভবত কোনো ভাড়াটে খুনীকে পাঠিয়েছিল।'

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, 'সর্বনাশ! রাত সাড়ে দশটা বাজে। তুমি বাতটা আমাব এখানে কাটিয়ে যাও জয়ন্ত! তোমার কাজেব ছেলেটিকে ফোনে জানিযে দাও। নাহ্! এত রাতে সল্টলেকে ফেরাব ট্যাক্সি পাবে না।'

একটু হেসে বললাম, 'আপনার নৈশ অভিযানের বিববণ শোনা যাক তাহলে!'

'খাওয়াব পব হবে।' বলে কর্নেল হাঁক দিলেন, 'ষষ্ঠী!'...

কর্নেলেব অ্যাপার্টমেন্টে এভাবে বাত কাটানো আমাব কাছে নতুন কিছু নয়। কতবাব তিনি আমাকে সল্টলেকের ফ্ল্যাটটা কাকেও ভাড়া দিযে তাঁর কাছে থাকতে বলেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, ওঁর ডেবায় এসে থাকলে আমাব খববেব কাগজেব চাকরিটা বাঁচানো কঠিন হবে। কারণ প্রায়ই উনি বেবিয়ে পড়েন কোনো দুর্লভ প্রজাতির অর্কিড, ক্যাকটাস, পাখি বা প্রজাপতির সন্ধানে এবং কখনও দেশের বাইরে কোনো দ্বীপ-দ্বীপান্তর কি মরুভূমিতে। অনেক সময় দুর্দান্ত বকমেব অ্যাডভেঞ্চারেও পাড়ি জমান। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা অবশ্য বহস্য-বোমাঞ্চে ভরা 'স্টোরি' প্রত্যাশা কবে আমার কাছে। কিন্তু এ সবেব একটা সীমা আছে। নিছক দুর্লভ প্রজাতিব উদ্ভিদ বা প্রাণী সম্পর্কে লেখাব মতো বিশেষজ্ঞের অভাব নেই দেশে। সপ্তাহে এক কলম সচিত্র ধানাই-পানাই বিদেশি পত্রিকা থেকে টুকে দিলেই হলো।

এ বাতে ষষ্ঠীচরণ আমাকে অবাক করে খাদিব নতুন পাঞ্জাবি-পাজামা, এমনকি একজোড়া নতুন চটিও সহাস্যে উপহাব দিল। সে বলল, 'বাবামশাই কবে আপনাব জন্য কিনে বেখেছেন, বলতে মনে ছিল না। এখানে রাত কাটাতে বরাবর দাদাবাবুকে বাবামশাইয়ের পোশাক পবতে হয়। আমিই বলেছিলাম, তার চেয়ে দাদাবাবুব সাইজমতো—'

কর্নেল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলে সে থেমে গেল। কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'বক্তৃতা করবি, না আমাদের খেতে দিবি? কী জয়ন্ত? একটা নতুন আলোয়ানের কথা ভাবছ নাকি? শীত আজ আছে কাল নেই।

সামনের বছর বেঁচে থাকলে দেখা যাবে। তবে আমার ঘরে যথেষ্ট ওম আছে। হেস্টিংস এরিয়ায় যা শীত, ওঃ!'...

নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি-চটি পরে সবে খেতে বসেছি, টেলিফোন বেজে উঠল। বিরক্ত মুখে কর্নেল তাঁর বেডরুমে ঢুকে ফোনটা ধরলেন। ড্রয়িং রুমের টেলিফোনেরই এক্সটেনশন এই ফোনটা। শুনলাম, কর্নেল বলছেন, '...কে? মালবিকা? কী ব্যাপার? ...সাংঘাতিক মানে? ...অ্যাঁ? বলো কী? কখন?...বেহালায় ডগ হসপিটাল—মানে, নতুন... কিন্তু জিমি তো...হ্যাঁ, হ্যাঁ। সন্ধ্যায় তাই তোমার বাড়িতে জিমির সাড়া পাইনি। তুমি কি একা গেছ ওখানে? ...ঠিক করেছ। মিঃ মুখার্জিকে বলো, তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। তাই যেতে পারিনি। কাল সকালে বরং...ঠিক আছে। সাবধানে চলাফেরা করো! গুড নাইট!'

ডাইনিং রুমে ঢুকে কর্নেল বললেন, 'মালবিকার কুকুর জিমি বিকেল থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমরা চলে আসার পব মালবিকা লক্ষ্মীকে দিয়ে জিমির রাতের খাবার পাঠিয়েছিল। জিমির নাকমুখ দিয়ে নাকি রক্ত বেরুচ্ছিল। মালবিকা মিঃ মুখার্জিকে ফোনে খবরটা দেয়। তারপর দুজনে বেচারাকে বেহালা ডগ হসপিটালে নিয়ে গেছেন। সেখানে যাওয়াব পথেই জিমি মারা গেছে।'

'আমি আপনাকে বলেছিলাম কুকুরটার সাড়া পাচ্ছি না।'

'আসলে তখন আমার মাথায় ছিল লক্ষ্মীর লাল সোয়েটার।' কর্নেল বললেন। 'বোঝা যাচ্ছে বাড়িরই কেউ মারাত্মক বিষ দিয়ে অ্যালসেশিয়ানটাকে মেরেছে। আজ রাতে আবার কিছু ঘটবে সম্ভবত।'

'ঘটবে যা, তা অনুমান করা যায়।'

কর্নেল রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, 'হুঁ। বলো।'

'খিড়কির দরজার তালা ভাঙবে বাচ্চু। তারপর টাকা এবং লক্ষ্মীকে নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছে।'

'দেখা যাক। মালবিকাকে সাবধানে থাকতে বললাম। বাহাদুরও এখন নিশ্চয় সতর্ক।'

খাওয়ার পর দুজনে ড্রয়িং রুমে গেলাম। কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরালেন। তারপর অভ্যাসমতো হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। বললাম, 'আপনি অতক্ষণ কোথায় ছিলেন, এবার বলুন। শোনা যাক।'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'লক্ষ্মীর সোয়েটার যথাস্থানে রেখে সোজা চলে

গিয়েছিলাম হেস্টিংস থানায়। অরিজিৎ ওঁদের আমার কথা বলে রেখেছিল। কাজেই আপ্যায়নের ত্রুটি হয়নি। ও. সি. তোমার বয়সী। সবে প্রমোশন পেয়ে ওখানে গেছেন। নাম প্রশান্ত মণ্ডল। কিছুদিন স্কুলটিচার ছিলেন ভদ্রলোক। যাই হোক, জিজ্ঞেস করে বুঝলাম নামকাওয়াস্তে তদন্ত চলেছে। পলিটিক্যাল প্রেশারের আভাসও দিলেন। চিত্রা দত্তের বডিগার্ডের নাম ওঁরা জেনে গেছেন। তাকে খোঁজা হচ্ছে। লুনা এসকর্ট সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ওদিকে লুনাও লালবাজার মিসিং স্কোয়াডের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে। হ্যাঁ—শুক্লার ঠিকানা পাওয়া গেছে। ওদের বাড়িতে পুলিশ যাবে।'

বললাম, 'এখনও যায়নি। গেলে তারকবাবু বলতেন বা এতক্ষণ ফোন করতেন আপনাকে।'

'হ্যাঁ। আজকাল পলিটিক্যাল প্রেশার এমন জিনিস, পুলিশকে সাবধানে পা বাড়াতে হয়।'

'অতক্ষণ আপনি থানাতেই কাটিয়ে দিলেন? বিশ্বাস হয় না।'

কর্নেল চোখ খুলে একটু হাসলেন। 'পার্ক লেনে গিয়ে লুনা এসকর্ট সার্ভিসের অফিসটা বাইরে থেকে দেখে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হলো, আমি কি শুক্লার দর্শন পাব বলে এখানে ওঁত পেতে আছি? কী বোকা, কী বোকা! আসলে এখনও আকস্মিকতা ব্যাপারটাতে আমার বিশ্বাস থেকে গেছে। যদি দৈবাৎ—'

কর্নেল আবার হেসে উঠলেন। বললাম, 'তারপর?'

'উল্টোদিকে মুনলাইট বার। তুমি তো চেনো। সেখানে গিয়ে ঢুকলাম। ওয়েটাররা আমাকে চেনে। ম্যানেজার ভদ্রলোকও চেনেন। একটা খালি টেবিলে এক জগ বিয়ার নিয়ে বসলাম। আবার সেই আশার ভূত আমাকে পেয়ে বসেছিল। যদি শুক্লা তার কোনো বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে এখানে ঢোকে! তুমি তো জানো, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড এদের যুগলের জন্য দোতলায় ছোট-ছোট কেবিন আছে। আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে এলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট হয়ে সোজা নিজের ডেরায়।' কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, 'শুক্লা সম্পর্কে আমি সত্যিই ক্রমশ উদ্বিগ্ন জয়ন্ত!'

'সে নিশ্চয় কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে। পুলিশ চিত্রাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। শুক্লা তাদের লক্ষ্য। এখন যদি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুমন হাজরা তাকে—'

কর্নেলের কথার ওপর বললাম, 'শুক্লাকে লুনা থেকে প্রদীপ সিনহাই চিত্রার বডিগার্ড হিসেবে জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তাই না?'

'হুঁ!' বলে কর্নেল কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে টেবিলের ড্রয়ার টানলেন।

টাকার বাণ্ডিলগুলো নেই দেখে চমকে উঠেছিলাম। বললাম, 'টাকাগুলো?'

'তুমি যখন বাথরুমে ঢুকেছিলে, তখন ওগুলো আলমারির লকারে রেখে এসেছি। কাল সকালে অরিজিৎকে টেলিফোনে কথাটা জানাব। টাকাগুলো লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে গচ্ছিত থাকবে।' বলে কর্নেল ড্রয়ারের ভেতর দিক থেকে রুমালে মোড়া সেই টয় পিস্তলটা বের করলেন।

তারপর টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে নলের ভেতরটা দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ দেখার পর টেবিলের একেবারে নিচের ড্রয়ার থেকে একটা খুদে চিমটে বের করলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'চিমটে দিয়ে নল সাফ করবেন নাকি?'

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে নলের ভেতর চিমটে ভরে কিছু টানাটানি করতে ব্যস্ত হলেন। একটু পরেই দেখি, গুটিয়ে রাখা লম্বা একটা ফিল্ম বেরিয়ে এল। ফিল্মটা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় দেখার পর কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'নেগেটিভ ফিল্ম। এক মিনিট। গুনে দেখি। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়। বাকি দুটো ব্ল্যাঙ্ক।'

'কিসের ছবি?'

'মনে হচ্ছে সেক্সুয়াল ব্যাপার। তুমি শুয়ে পড়ো গে। আমি এখনই এগুলো প্রিন্ট করে ফেলব।' কর্নেল পিস্তলটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে তুম্বো মুখে উঠে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেক্সুয়াল সিনের ফটো?'

কর্নেল আমার দিকে চোখ কটমটিয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'এখনও বুঝতে পারছ না প্রদীপ সিনহা পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকার বিনিময়ে তাঁর ব্ল্যাকমেলারের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন?'...

।। ছয় ।।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। বাথরুমের পাশে কর্নেলের ডার্করুম, যেখানে উনি নিজেই নিজের তোলা ছবি ডেভালাপ এবং প্রিন্ট করেন। ওঁর এ কাজের জন্য একটা পোর্টেবল সরঞ্জামও আছে। বাইরে কোথাও গেলে সেটা সঙ্গে নিয়ে যান। বিদেশি বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকায় ওঁর সচিত্র প্রবন্ধ বেরোয় এবং তা থেকে বেশ রোজগারও হয়। সেই টাকায় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো রহস্য ফাঁস করার অভ্যাস। কখনও ওঁকে এ ব্যাপারে কারও কাছে ফি নিতে দেখিনি। আসলে এ-ও ওঁর একটা হবি।

নেগেটিভ ফিল্মে যৌনদৃশ্যের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম প্রদীপ সিনহার চরিত্রদোষ ছিল। কিন্তু ফটোতে ওঁর ফিমেল পার্টনার কে হতে পারে? চিত্রা দত্ত, কিংবা অন্য কেউ? সে যেই হোক, প্রদীপ সিনহাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করার জন্য আড়াল থেকে ছবিগুলো তুলে রেখেছিল। বোঝাই যায়, ওঁর স্ত্রী মালবিকাকে ছবিগুলো দেখানোর হুমকি দিয়ে ওঁকে কেউ ব্ল্যাকমেল করত। চিত্রা দত্ত, না কি তার বডিগার্ড শুক্লা দাশ? শেষে মূল নেগেটিভ ফেরত দেওয়ার রফা হয়েছিল নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকায়। অবশ্য সন্দেহের কাঁটা যুক্তিসঙ্গত কারণে শুক্লার দিকেই ঘুরে গেছে—অন্তত আমার কাছে।

ষষ্ঠীর ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। তাকিয়ে দেখি, তার হাতে প্যাকেটে মোড়া একটা নতুন টুথব্রাশ। সে সহাস্যে বলল, 'আটটা কখন বেজে গেছে। বাবামশাই আপনাকে ওঠাতে বারণ করেছিলেন। এই দেখুন, বাজার করতে গিয়ে টুথবেরাশ কিনে এনেছি। এত বেলায় বাসিমুখে চা খেতে নেই। উঠে পড়ুন!'

বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। বললাম, 'তোমার বাবামশাই কোথায়?'

'ছাদের বাগানে। অন্যদিন আটটার মধ্যে নেমে আসেন। বোধ করি, কোনো গাছে পোকা লেগেছে। বাইরের দরজায় চাবি এঁটে বাজারে গিয়েছিলাম। ওপরে আমাকে দেখলেই তো রাগ করেন। আপনি বাথরুম সেরে নিন দাদাবাবু!'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলাম ষষ্ঠীর হাতে চায়ের পেয়ালা। সে জানে, সকালে আমি কর্নেলের মতো কফি খাইনে।

কর্নেল তখনও ছাদ থেকে নামেননি দেখে চায়ের পেয়ালা হাতে ছাদের

বাগানে গেলাম। দেখলাম, প্রকৃতিবিদ হাঁটু মুড়ে বসে কাঁটালের মতো দেখতে একটা ক্যাকটাসে আতস কাচ দিয়ে কিছু দেখছেন। আমার দিকে না ঘুরেই বললেন, 'মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি শেষ পর্যন্ত সুনিদ্রা হয়েছে!'

বললাম, 'কুনিদ্রা বলতে পারেন!'

'সব কাগজেই সিনহাসায়েবের খবর বেরিয়েছে। তোমাদের কাগজে একটু ফলাও করে প্রায় হাফ কলাম। হেডিং দিয়েছে, রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড। আজকাল রাজনৈতিক খবর একঘেয়ে হয়ে উঠেছে বলে খুনখারাপির খবরকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

'ফটোগুলোর প্রিন্ট কেমন হয়েছে, তাই বলুন!'

কর্নেল হাসলেন। 'তুমি এখনও ইয়ং ম্যান। এই সক্কালবেলা তোমাকে সেগুলো দেখালে তোমার চরিত্রদোষ ঘটবে।'

'প্রদীপ সিনহার মতো?'

কর্নেল চুপচাপ নিজের কাজে মন দিলেন। খুদে একটা কাঁচিতে কাঁটাল আকৃতিব ক্যাকটাসটার কাঁটা ছেঁটে দিলেন। তারপর সম্ভবত কীটনাশক ওষুধ স্প্রে কবে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'তুমি প্রদীপ সিনহার মতো বড়লোক নও। তবে তোমার যৌবন আছে। যৌবন অবশ্য যৌবনকে টানে। কিন্তু কোনো ফিল্ম নায়িকাকে নিছক যৌবন কাছে টানতে পারে কিনা জানি না।'

'বুঝলাম, ছবিতে ফিমেল পার্টনার সেই চিত্রা দত্ত।'

কর্নেল তাঁর সরঞ্জাম গুটিয়ে কোণের দিকে ছোট্ট ঘরের ভেতর রেখে এলেন। ছাদের একটা পাইপের মুখে জলের ট্যাপ খুলে হাত ধুলেন। তারপর বললেন, 'চলো। ড্রয়িং রুমে বসে কথা বলা যাবে।'

নিচে নেমে কর্নেল গার্ডেনিংয়ের জোব্বা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি ড্রয়িং রুমে সোফায় বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল পোশাক বদলে ফিরে এলেন। ইজিচেয়ারে বসে বললেন, 'চিত্রাকে আমি দেখিনি। তাই বলতে পারছি না ফিমেল পার্টনার সে-ই কি না। তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিক কারণেই বলা চলে, কোনো মেয়ে যতই কেরিয়ারিস্ট হোক, নিজের সঙ্গে কোনো পুরুষের গোপন যৌনদৃশ্যের ফটো তোলার জন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে কাজে লাগাবে না।'

'আমার ধারণা ঠিক তা-ই।'

'তুমি কি চিত্রা দত্তের কোনো ফিল্ম দেখেছ?'

'নাহ্। নাম শুনেছি বলেও মনে পড়ছে না।'

ষষ্ঠীচরণ কর্নেলের জন্য কফি রেখে গেল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে

বললেন, 'চিত্রার একটা ছবি দরকার। গোপালবাবুকে এখন ফোনে পাওয়া যেতে পারে।'

কফির পেয়ালা টেবিলে রেখে টেলিফোন ডায়াল করার পর সাড়া পেয়ে কর্নেল বললেন, 'গোপালবাবু আছেন?...কখন ফিরবেন বলে গেছেন?...আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। উনি এলে ওঁকে বলবেন আমাকে যেন অবশ্য-অবশ্য রিং করেন।...আচ্ছা। রাখছি।'

বললাম, 'বাড়িতে নেই?'

কর্নেল কফিতে মন দিলেন। একটু পরে বললেন, 'দেখা যাক। উনি ফোন না করলে বরং জয়শ্রী স্টুডিয়োতে গিয়ে হানা দেব। জয়ন্ত, তুমি আমার এখানে ব্রেকফাস্ট সেরে নেবে। তারপর সল্টলেকে গিয়ে নির্ভয়ে তোমার গাড়িটা নিয়ে আসবে। গাড়ি থাকলে সুবিধে হয়। ফুয়েল খরচের জন্য চিন্তা করো না।'

'কী বলছেন? ফুয়েল খরচ দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার। চিফ অব দি নিউজ ব্যুরো সত্যদাকে সময়মতো জানিয়ে দেব। এমন একখানা এক্সক্লুসিভ স্টোরি পেলে সার্কুলেশন আবার বেড়ে যাবে। ইদানীং সার্কুলেশন একটু পড়ে যাচ্ছে।'

কর্নেল চুপচাপ কফি শেষ করে আবার টেলিফোন ডায়াল করলেন। 'অরিজিৎ? ...তুমি আমার গলা শুনেই চিনতে পারো। স্বাভাবিক ডার্লিং! তুমি গোয়েন্দাকর্তা নাম্বার ওয়ান।...না, না। তুমি ..শোনো, যেজন্য আবার রিং করছি। ছাদের বাগানে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো, টাকাগুলো বরং ক্লিফটন রোডে মিসেস সিনহার বাড়িতে এবং ওদের লইয়ার মিঃ এস. কে. মুখার্জির সামনে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। এতে আইনের দিক থেকে আমি নিরাপদ থাকব? তাই না?...হ্যাঁ। তুমি থাকবে এবং হেস্টিংস থানার ও. সি. বা ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের উপস্থিত থাকা দরকার।...হ্যাঁ, তোমার উদ্বেগ টের পেয়েছিলাম।... থ্যাঙ্কস। রাখছি।'

কর্নেল ফোন রেখে আমার দিকে তাকালেন। বললাম, 'কখন যাচ্ছেন ও বাড়িতে?'

'অরিজিৎ লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের ঘরে রুটিন কনফারেন্স সেরে বেরুবে। পৌঁছুতে সাড়ে বারোটা তো হবেই। তুমি ব্রেকফাস্ট করেই ট্যাক্সিতে চলে যাবে। ফিরবে অন্তত সাড়ে দশটার মধ্যে।'

'তার আগেই ফিরে আসব।' বলেই একটু অস্বস্তি হলো। 'আচ্ছা কর্নেল, মিঃ মুখার্জির দারোয়ান ফাগুলাল আমার গাড়ির নাম্বার দেখে হইচই বাধাবে

না তো? লোকটাকে মনে হচ্ছিল, সব ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যাস আছে।'

'পুলিশের গাড়ির সঙ্গে তোমার গাড়ি থাকবে। কাজেই এ নিয়ে চিন্তা করো না।'...

সল্টলেক থেকে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস হয়ে আমার গাড়ি কর্নেলের বাড়ি পৌঁছুতে মাত্র আধঘণ্টা সময় নিয়েছিল। কাঁটায়-কাঁটায় দশটা বাজে। লনের পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে কর্নেলের তেতলার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখি, ড্রয়িং রুমে জয়শ্রী স্টুডিয়োর গোপালবাবু, শুক্লার বাবা তারকবাবু এবং একজন তাগড়াই চেহারার ভদ্রলোক বসে আছেন।

কর্নেল আমাকে দেখে বললেন, 'এস জয়ন্ত! গোপালবাবু এবং তারকবাবুকে তুমি চেন। ইনি হলেন মিঃ রথীন্দ্র সান্যাল। লুনা এসকর্ট সার্ভিসের প্রোপ্রাইটার। এক্স সার্ভিসম্যান। ডিফেন্সে ভেহিক্‌ল্‌স্‌ ডিপার্টমেন্ট থেকে রিটায়ার করে এই সিকিউরিটি এজেন্সি খুলেছেন। মিঃ সান্যালকে তো জয়ন্তের কথা আগেই বলেছি।'

মিঃ সান্যালের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে একটু তফাতে ডিভানে বসলাম। লক্ষ্য কবলাম আগন্তুকদের মুখে কেমন গাম্ভীর্য আব উদ্বেগ থমথম করছে। গোপালবাবু বললেন, 'তা যা বলছিলাম, ঝটপট সেরে নিই। আমাকে বাড়ি ফিরে স্টুডিয়োতে দৌড়ুতে হবে।'

তারকবাবু বললেন, 'সুমনবাবুর কথাটা আগে বলুন কর্নেলসায়েবকে।'

গোপালবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সেটাই তো বলছি। সুমন হাজরার কাছে—বুঝলেন কর্নেলসাযেব? তারকবাবুকে ভোরবেলা যেতে বলেছিলাম। কারণ নেতা লোকদের ব্যাপার। এই আছেন এই নেই। তাবকবাবু লেকটাউনে ওঁর কাছে গিযে সব কথা খুলে বলার পর—'

তারকবাবু বললেন, 'প্রথমে খেঁকিয়ে উঠেছিলেন। শেষে বললেন, জয়শ্রী স্টুডিয়োব ম্যানেজারকে দেখা করতে বলবেন। আমি আজ বাড়িতেই থাকছি। ঠাণ্ডা-লাগা জ্বর মতো হয়েছে।'

গোপালবাবু হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'নিন! আপনিই বলুন!'

বুঝলাম, মেয়ে নিখোঁজ হওয়ায় তারকবাবুর এই ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। তিনি করুণ মুখে বললেন, 'না, না। মানে আসল কথাটা হলো শুক্লা ফিল্ম স্টারের সঙ্গে বোম্বে যায়নি। বেশ! তাহলে সে গেল কোথায়? এদিকে সান্যালসায়েববা লালবাজারে জানিয়ে রেখেছেন। এখন উল্টে পুলিশ এসে ওঁকে—আবার আমাকেও হুমকি দিয়ে গেছে।'

গোপালবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, 'মোটকথা সকাল আটটা নাগাদ তারকবাবু ঘুম থেকে আমাকে ওঠালেন। সুমনবাবুকে তখনই রিং করলাম। তো অবাক কাণ্ড কর্নেলসায়েব! চিত্রা বোম্বে গিয়েই সুমনবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে। কাজেই সুমনবাবু জানেন, চিত্রা কোথায় আছে। কিন্তু কেন হঠাৎ অমন করে বোম্বে গেল, সে-কথা হয়তো সুমনবাবুকে বলে থাকবে ফোনে। আমাকে সুমনবাবু ভেতরকার কথা কিছু বললেন না। তবে শুক্লার ব্যাপারে পুলিশকে বলবেন বললেন। আমার তো মনে হলো, আজই সুমনবাবু বোম্বে দৌড়ুবেন।'

কর্নেল বললেন, 'সুমনবাবু প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। পুলিশকে উনি বলে দিলে নিশ্চয় শুক্লাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।'

মিঃ সান্যাল গম্ভীর মুখে বললেন, 'কিন্তু আমি আমার পুলিশসোর্স থেকে শুনেছি, পুলিশ শুক্লাকে মার্ডার-চার্জে অ্যারেস্ট করবে। কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন কর্নেলসায়েব! আমার এজেন্সির কোনো লোকের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন হয়নি। কারণ আমরা পুলিশকেও সহযোগিতা করি। পুলিশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রেখে চলতে হয়।'

'বলুন, আমি কী করতে পারি এ ব্যাপারে?' বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। 'শুক্লাকে যতক্ষণ পর্যন্ত খুঁজে না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ আমার কিছু করার নেই।'

'আমার প্রব্লেম আপনি বুঝতে পারছেন। আমার এজেন্সির দুর্নাম রটে যাবে।'

'আপনারা শুক্লাকে টয়-পিস্তল দিয়েছিলেন কেন?'

'খুলেই বলি। শুক্লা ইনসিস্ট করত। সব সময় ক্যারাটে বা জুডো কাজে লাগানো যায় না। তাছাড়া যে ফিল্মস্টারের বডিগার্ড করে ওকে পাঠানো হয়েছে, শুক্লার ধারণা, ফায়ার আর্মস ছাড়া তাকে সে হয়তো বাঁচাতে পারবে না। দুদিন আগে শুক্লা ফিল্মস্টার চিত্রা দেবীকে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে নিয়মমতো আমার অফিসে রিপোর্ট করতে এসেছিল। তখন রাত প্রায় দশটা। আমাদের অফিস চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। শুক্লা বলল, আজ সন্ধ্যায় একটা সাংঘাতিক বিপদ থেকে বেঁচে এসেছে। প্রদীপ সিনহার বাড়িতে চিত্রা দেবী ওঁদের নেক্সট প্রোডাকশানের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। ওঁদের সঙ্গে চিত্রনাট্যকার ভদ্রলোকও ছিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ ওঁরা ফিরে আসছিলেন। ক্লিফটন রোডের একটা গলি থেকে আচমকা একটা গাড়ি জোরে বেরিয়ে আসে। চিত্রা নিজে ড্রাইভ করছিলেন। শুক্লা স্টিয়ারিং ধরে ফেলেছিল। সে সামনের সিটে বসে ছিল। কিন্তু অ্যাকসিডেন্ট থেকে বেঁচে

যাওয়ার চেয়ে সাংঘাতিক ঘটনা হলো, চিত্রার গাড়ির দিকে সেই গাড়ি থেকে কেউ গুলি ছুঁড়েছিল। গুলিটা সামনের ডোর প্যানেলের ওপরে লাগে। চিত্রা বেঁচে যান। ডোর প্যানেলের ওপর একটু জায়গার রঙ চটে গিয়েছিল শুধু। তার মানে, গুলিটা চিত্রার গাড়ির প্যারালালে ওই জায়গাটায় লেগে সোজা বেরিয়ে যায়। এরপর শুক্লা নিজে ড্রাইভ করে ওঁকে পৌঁছে দেয়।'

কর্নেল বললেন, 'ইন্টারেস্টিং! কিন্তু এমন ঘটনার পর আপনারা ওকে নিছক টয় পিস্তল দিলেন?'

'প্রব্লেম হলো, আমাদের মাত্র পাঁচটা বন্দুকের লাইসেন্স আছে। সে-ও ডিফেন্সে আমার পরিচিত হায়ার র‍্যাঙ্কের এক অফিসারের সুপারিশে পাওয়া গিয়েছিল। একটা রিভলভারের লাইসেন্স আমার নিজের জন্য আছে। পয়েন্ট থার্টি সিক্স ক্যালিবার। সেটা তো শুক্লাকে দেওয়া যায় না। দিতে গেলে পুলিশের পারমিশন চাই। অনেক প্যারাফার্নেলিয়া আছে। আপনি তা নিশ্চয় জানেন!'

কর্নেল হাসলেন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য টয় পিস্তল অনেক সময় কাজে লাগে। কাগজে পড়েছিলাম, একবার বিমান ছিনতাইও করা হয়েছিল।'

'কিন্তু ওই পিস্তলটাতে এমন ব্যবস্থা ছিল, যাতে পর-পর আঠারোটা ফল্‌স্ কার্টিজ ফায়ার করা যায়। পটকার মতো শব্দ হবে। ধোঁয়াও বেরুবে। কিন্তু কেউ তাতে আহত হবে না।'

'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ট্রিগার টানলে?'

কর্নেল চোখে হেসে আবার আমার দিকে তাকালেন। মিঃ সান্যাল বললেন, 'নাহ্। জাস্ট একটুখানি ছ্যাঁকা লাগবে। তার বেশি কিছু না।'

গোপালবাবু নড়ে বসলেন। 'বাপ্‌স্! কানের পাশে নল ঠেকিয়ে ফায়ার করলে কানের পর্দা আস্ত থাকবে? কারণ পটকার মতো শব্দের কথা বললেন!'

তারকবাবু বললেন, 'আমাকে অফিসে যেতে হবে। কর্নেলসায়েব! আপনি দয়া করে শুক্লাকে খুঁজে বের করুন। করজোড়ে বলছি—'

হাত তুলে কর্নেল বললেন, 'যথাসাধ্য করব।'

মিঃ সান্যাল উঠলেন। 'আমারও অনুরোধ রইল সার! পুলিশসোর্সে আপনার পরিচয় আমি পেয়েছি বলেই তারকবাবুর সঙ্গে আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। চলুন তারকবাবু! আপনাকে আমার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে লালবাজারে যাব। গোপালবাবু কি বেরুবেন? আপনার অবশ্য নিজের গাড়ি আছে। স্টুডিয়োতে যাবেন তো এখন?'

'আপনারা চলুন।' গোপালবাবু সোয়েটারের ভেতর হাত ভরে নস্যির কৌটো

বের করলেন। কৌটো খুলে বললেন, 'আমি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে তবে স্টুডিয়োতে যাব।'

ওঁরা দুজন বেরিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, চিত্রা নিজের তাগিদেই বোম্বে পালিয়েছে।'

গোপালবাবু বললেন, 'মিঃ সান্যালের কথা শুনে তা-ই মনে হচ্ছে। শুধু বুঝতে পারছি না সুমন হাজরার মতো শক্ত গার্জেন থাকতে চিত্রা সিনহাসায়েবের সাহায্য নিল কেন?'

'গোপালবাবু, চিত্রার কোনো ছবি আমাকে যোগাড় করে দিতে পারেন?'

'এক্ষুণি পারি। আমার গাড়িতে খানকয়েক সিনেমা পত্রিকা পড়ে আছে। নিয়ে আসি।' বলে গোপালবাবু হন্তদন্ত বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে মিটিমিটি হেসে বললেন, 'ভাগ্যিস তুমি বেগড়বাঁই করোনি জয়ন্ত! তাহলে তোমার অন্তত কয়েক ইঞ্চি চুল জ্বলে পুড়ে যেত। ঘা গজাত। ব্যান্ডেজ বাঁধতে হতো। জোর বেঁচে গেছ! ভবিষ্যতে আর কখনও কাউকে—'

ওঁর কথার ওপর বললাম, 'আমার লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস এবার থেকে সবসময় সঙ্গে রাখব।'

কর্নেল সকৌতুকে বললেন, 'সঙ্গে এনেছ বুঝি?'

'এনেছি।'

'বাহ্। তবে—মাই গুডনেস! মিঃ সিনহার কেসে মর্গের রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ শেষ পর্যন্ত কী মত দিলেন জানা দরকার।' বলে কর্নেল টেলিফোন ডায়াল করলেন। তারপর সাড়া পেয়ে বললেন, 'মিঃ মণ্ডল? আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।...হ্যাঁ। বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব। আপনি মিসেস সিনহা এবং ওঁদের লইয়ার মিঃ মুখার্জিকে জানিয়েছেন আশা করি? তো শুনুন! এখনই মনে পড়ল, মর্গের রিপোর্ট সম্পর্কে ফরেন্সিক এক্সপার্ট...অ্যাঁ? পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে নয় বলেছেন?...অন্তত দু মিটার ডিসট্যান্স থেকে?...হ্যাঁ। আপনার থিয়োরি ঠিক আছে। সেই ছাতিম গাছটার আড়াল থেকেই কেউ...হ্যাঁ, শুক্লা দাশ ছাড়া আর কে হতে পারে?...হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেয়ার ওয়াজ এ থার্ড পার্সন, যাকে মিঃ সিনহা টাকাগুলো দিতে গিয়েছিলেন।...ইউ আর রাইট। ব্ল্যাকমেলের ব্যাপার। আচ্ছা, রাখছি। বারোটায় দেখা হবে। থ্যাঙ্কস্।'

বললাম, 'এই তৃতীয় ব্যক্তির কথা আপনি বলেছেন। আমার ধারণাও তা-ই। কিন্তু এখন তো চোখ বুজে বলা যায়, বাচ্চুই খুনী।'

কর্নেল চোখ বুজে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বলা কঠিন। এমন কি-

হতে পারে না যে, প্রদীপ সিনহা চুপিচুপি নেমে গিয়ে আগে খিড়কির দরজা খুলে রেখেছিলেন? সন্ধ্যার পর থেকে ওদিকে কেউ যায় না। কাজেই কোনো সুযোগে টাকার খবর জানতে পেরে কেউ শুক্লা পৌঁছনোর আগেই বাড়িতে ঢুকে ছাতিম গাছের আড়ালে ওঁত পেতে বসে ছিল। তারপর বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া—'

ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁক দিলেন, 'ষষ্ঠী!'

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম আছে। ভেতর থেকে খোলা যায়। বাইরে থেকে খোলা যায় না। কাজেই গোপালবাবু কিছুক্ষণ হাতল ঘোরানোর ব্যর্থ চেষ্টার পর ডোরবেলের সুইচ টিপেছেন। তিনি ভেতরে এসে বললেন, 'বড্ড বেয়াড়া দরজা আপনার!'

ওঁর হাতে চারটে 'কল্পলোক' পত্রিকা ছিল। কর্নেলের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি এতে চিত্রা সম্পর্কে সচিত্র সরস গল্প পাবেন। কল্পলোকের বৃত্তান্ত তো! আসলে এতে পাবলিসিটি হয়। সব অভিনেতা-অভিনেত্রীই চায়, তাদের নিয়ে মুখরোচক গল্প রটে যাক। আমি চলি কর্নেলসাযেব!'

'হোটেল ইন্টারন্যাশানালে আপনার সোর্স আর কোনো খবর দেয়নি?'

'নাহ্। যাকে নিয়ে খবর, সে-ই তো ভোঁ কাট্টা। চলি কর্নেলসায়েব! জয়ন্তবাবু চলি!'

কর্নেল পত্রিকাগুলো হাতে নিয়ে ওপরের সংখ্যাটার মলাটে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। চিত্রাই বটে!'

বললাম, 'দেখি, দেখি!'

পত্রিকাগুলো আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে উনি উঠলেন। চারটে সংখ্যার মলাটে চারজন নায়িকার ছবি। তারপর লক্ষ্য করলাম, ছবিগুলো ফিল্মের বিজ্ঞাপন আসলে। কোণে খানিকটা জায়গায় ফিল্মের নাম, প্রযোজক-পরিচালক-নায়ক-নায়িকার নাম সুন্দব অক্ষরে ছাপা আছে। খুঁজতে খুঁজতে চিত্রার নাম বেরিয়ে পড়ল। অর্ধবসনা বললেই চলে। বিশেষ করে নারী-শরীরের এই ভঙ্গিতে একটা ছন্দ অবশ্যই আছে। কিন্তু আর্টকে চাপা দিয়েছে অশালীন যৌনতা। লাবণ্য ছাপিয়ে আদিম জৈব একটা চেতনা চোখকে জ্বালিয়ে দেয়। আমি ছবিটার দিকে আর তাকাতে পারলাম না। কারণ তখনই মনে পড়ে গেল এই যুবতী ছিল চল্লিশ বছর বয়সী প্রদীপ সিনহার সেক্স পার্টনার!

কর্নেল আলমারি খুলে একটা খাম বের করে ভেতর থেকে একটা প্রিন্ট টেনে চোখ বুলিয়েই রেখে দিলেন। খামটা আবার যথাস্থানে রেখে আলমারি বন্ধ করে ফিরে এলেন। ইজিচেয়ারে বসে বললেন, 'এ যুগে কেরিয়ারিজম শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষদেরও বেপরোয়া করে তুলেছে। বরং পুরুষদের

সুযোগটা বেশি। তাদেব শরীরের মূল্য দিতে হয় না। মেয়েদের শরীর ছাড়া তত সুযোগ সামনে আসে না। নাহ্! অনেকে আমাকে মেল শোভিনিস্ট্ ভাবতে পারে। আমি তা মোটেও নই। সম্ভবত চিত্রার ছোটবেলার পরিবেশ এজন্য দায়ী।'

টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল বিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। '...হ্যাঁ। বলো মালবিকা!...না, না। আমাকে ভুল বুঝেছ! আসলে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাপারটা তোমাকে আগে থেকে জানাইনি। কাবণ তোমার টেলিফোনে কেউ আড়িপাতা যন্ত্র জুড়ে রাখেনি কে বলতে পারে? কাজেই আগে পুলিশকে জানিয়ে...মালবিকা! এটাই কিন্তু লিগ্যাল প্রশিডিওব। তুমি আইনজ্ঞ মিঃ মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করতে পারো।...হ্যাঁ। এই কুড়িয়ে পাওয়া টাকাব ব্যাপারে আমার একটা দাযিত্ব—মবাল অ্যান্ড লিগ্যাল—থেকে গেছে। কাজেই...না, না। তোমার চিন্তার কোনো কাবণ নেই। আমবা যথাসময়ে যাচ্ছি। তুমি শুধু মিঃ সিনহার চেকবইগুলো দেখে রাখো, কবে উনি ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলেছিলেন। কেমন? রাখি তাহলে? ...জাস্ট এ মিনিট! লক্ষ্মী বাড়ি গেছে?...বাচ্চু?...হ্যাঁ। আমাব বাচ্চুকে সন্দেহ হচ্ছে। জানো? গত বাতে আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে বলি বাচ্চুকে যেন চোখে-চোখে বেখো। ওকে ছাড়িযে দিও না। কিন্তু...পেছনের দরজার তালা ভেঙে পালিযেছে? পুলিশকে জানিযেছ তো?...ব্যস। ঠিক আছে।'

কর্নেল টেলিফোন বেখে আমাব দিকে তাকালেন। বললাম, 'বাচ্চু সেই তৃতীয ব্যক্তি, এতে এবাব সিওব হওয়া যায।'

'হুঁঃ!'

'আমিও কিন্তু গোড়া থেকে একথা বলে আসছি।'

'হুঁঃ!'

কর্নেলের চোখ বুজে হুঁ হুঁ করা আমাব কাছে ববাবর হেঁয়ালি। বললাম, 'আপনি ধ্যান করুন। ততক্ষণ ববং আমি চিত্রার সম্পর্কে মুখবোচক চানাচুর চিবুতে থাকি।'

মুখবোচক শুধু নয, চক্ষুছানাবড়াকারীও বটে। প্রদীপ সিনহা আর সুমন হাজবাকে চিত্রাব সঙ্গে জড়িয়ে কাব্যিক ভাষায় চমকপ্রদ প্রতিবেদন। কে লিখেছে, তার নাম নেই। অনেকগুলো রঙিন ছবি দিযে সাজিযেছে।

হঠাৎ কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত! বেরুব। পোশাক বদলে আসি।'

'মোটে তো এগাবোটা বাজে!'

'আমরা ভবানীপুব হয়ে যাব।'

একটু পরে যখন আমরা বেরুলাম, তখন কর্নেলের হাতে একটা ব্রিফকেস

যার ভেতর সেই পাঁচটা নোটের বাণ্ডিল আছে। টয় পিস্তলটা ওঁব টেবিলেব ড্রয়ারে থেকে গেল।

কর্নেলের নির্দেশে পি জি হাসপাতালেব পাশ দিয়ে এগিয়ে এ-বাস্তা থেকে সে-বাস্তা এবং তারপর একটা গলিতে ঢুকে শেষপ্রান্তে মোটামুটি চওড়া রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় কবাতে হলো। ব্রিফকেসটা আমার জিম্মায় বেখে কর্নেল বললেন, 'একটু অপেক্ষা কবো। আসছি।'

ব্রিফকেসে পঞ্চাশ হাজাব টাকা। তাই অস্বস্তি হচ্ছিল। কর্নেল গাড়িব পেছনদিকে এগিয়ে যে বাড়িব গেটে ঢুকে গেলেন, সেটা একটা বিশাল বাড়ি এবং খুবই পুবনো। আসবার সময় লক্ষ্য কবেছিলাম, এই এলাকায এ ধবনেব পুবনো প্রাসাদোপম বেশ কয়েকটি বাড়ি আছে। কোনো-কোনোটিব অবস্থা জবাজীর্ণ। কোনোটি ভেঙে ফেলে বহুতল বাড়ি তৈবিব আয়োজন চলেছে।

সময় কাটছিল না। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, কেউ হয়তো আমাদেব গাড়ি অনুসবণ কবে এসেছে এবং অতর্কিতে এসে হামলা চালিয়ে ব্রিফকেসটা লুঠ কবে পালাবে। জ্যাকেটেব ভেতব আমাব আগ্নেয়াস্ত্রটিব দিকে মন পড়ে ছিল এবং কাছাকাছি কোনো গাড়ি এসে থামলেই তৈবি থাকছিলাম।

কর্নেল ফিবে এলেন প্রায মিনিট কুড়ি পবে। গাড়িতে ঢুকে বললেন, 'যেদিক থেকে এসেছি সেদিকেই চলো। আমবা বেসকোর্সেব পাশ দিয়ে যাব।'

গাড়ি ঘুবিযে গলিপথে যাবাব সময জিজ্ঞেস কবলাম, 'বনেদি বাড়ি মনে হলো। বাড়িটা কাব?'

কর্নেলকে খুব গম্ভীব দেখাচ্ছিল। আস্তে বললেন, 'তুমি চিনবে না। কলকাতাব অনেক বনেদি পবিবাবেব সঙ্গে আমাব পবিচয় আছে, তা তো তুমি জানো।' উনি চুরুট ধবিযে হেলান দিয়ে বসলেন। টুপিটা মুখেব ওপব ঝুঁকে এসেছিল। ঠেলে তুলে দিলেন। তাবপব চোখ বুজে একেবাবে ধ্যানস্থ।

হেস্টিংস থানাব সামনে গিযে দেখলাম, বেতাবভ্যানে সশস্ত্র পুলিশ এবং কযেকটি লাল জিপগাড়ি। ফুটপাতে একদঙ্গল কনস্টেবল। কযেকজন অফিসাব বেটন হাতে দাঁড়িযে আছেন। কর্নেলকে দেখে একজন অফিসাব এসে অভিবাদন জানালেন। কর্নেল ব্রিফকেস নিয়ে নেমে গিয়ে বললেন, 'জযন্ত! তুমি কোথায় গাড়ি পার্ক কববে জেনে নাও। আমি এখানে অপেক্ষা কবছি।'

পুলিশ অফিসাবটি আমাকে বললেন, 'ওই সাদা অ্যাম্বাসাডাবেব পাশে পার্ক করুন।'

গাড়ি লক করে এসে কর্নেলের সঙ্গে থানার গেটে ঢুকলাম। আস্তে বললাম, 'ব্যাপার কী? এত আয়োজন!'

কর্নেল বললেন, 'স্বয়ং ডি সি ডি ডি আসবেন। তাছাড়া এমনও হতে পারে, নতুন কিছু ঘটেছে।'

'বলেন কী!'

'দেখা যাক।'

ও. সি. মিঃ মণ্ডলের ঘরে ঢুকতেই তিনি কর্নেলকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'বসুন সার! আপনাকে একটু আগে রিং করেছিলাম। আপনার সারভ্যান্ট বলল, আপনি বেরিয়ে গেছেন।'

কর্নেল বসলেন। পাশের চেয়ারে আমিও বসলাম। কর্নেল বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই। জয়ন্ত চৌধুরী। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার।'

মিঃ মণ্ডল আমাকে নমস্কারের একটু ভঙ্গি করে বললেন, 'ম্যান অব ওয়ার জেটির কাছে গঙ্গার ধারে ঝোপের মধ্যে একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে। সম্ভবত জলে ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। চোখে পড়ে না এমন কতকগুলো ঝোপের ভেতর আটকে গিয়েছিল। খবর পেয়ে এস আই রাজেনবাবু গিয়েছিলেন। তিনি বডিটা তুলে মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। জিনস-জ্যাকেট পরা একটা মেয়ের ডেডবডি। পিঠের দিকে দু জায়গায় গুলি করে মারা হয়েছে। বডিতে রাইগর মর্টিসের শেষ পর্যায়ে পচ ধরার লক্ষণ ছিল।'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'শুক্লা দাশ। ফিল্মস্টার চিত্রা দত্তের বডিগার্ড।'

'হ্যাঁ সাব। মর্গে তার বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একটু আগে খবর পেলাম, উনি তাঁর মেয়ের লাশ শনাক্ত করেছেন।' বলে প্রশান্ত মণ্ডল একটু হাসলেন। 'এবার বাচ্চুটাকে পেলেই প্রব্লেম সলভ্‌ড্‌!'...

।। সাত ।।

কর্নেলের আপত্তি সত্ত্বেও কফি আর বিস্কুট এল। ও. সি. প্রশান্ত মণ্ডলের অনুরোধে কর্নেল কফিতে চুমুক দিলেন। আমার অবশ্য এ মুহূর্তে উষ্ণ পানীয়ের দরকার ছিল। মিঃ মণ্ডল মাঝে মাঝে টেলিফোনে কারও সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছিলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। চুরুট ধরিয়ে কর্নেল বললেন, 'বাচ্চুর ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে পেরেছেন কি?'

মিঃ মণ্ডল বললেন, 'হ্যাঁ। ফিল্মলাইনে ঘোরাঘুরি করত একসময়। অ্যান্টিসোশ্যাল তো বটেই। প্রোডিউসারদের কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায় করত। কিন্তু আমাদের সার হাত-পা বাঁধা। পলিটিক্যাল প্রেসার আসে। ওকে জেরা করে কিন্তু কিছুই জানা যায়নি। হার্ড নাট যাকে বলে।'

'ওর আসল নাম কী?'

'স্বপন ঘোষ। বর্ধমানের গ্রামের ছেলে। ভগ্নীপতির কাছে থাকত। ঠিকানা পাওয়া গেছে। ওকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল—' টেলিফোন বেজে উঠলে প্রশান্ত মণ্ডল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। 'হ্যাঁ সার। এসে গেছেন।...লাহিড়িসায়েব এখনও বেরোননি?...ঠিক আছে।...হ্যাঁ, ধরছি।' রিসিভার কাঁধে আটকে মিঃ মণ্ডল বললেন, 'কমিশনারসায়েবের ঘরে কনফারেন্স এখনও চলছে।...হ্যাঁ, বলুন সার! ডি সি-সায়েব আসছেন না?...আচ্ছা!... বুঝেছি।...হ্যাঁ সার, লিগ্যাল প্রব্লেম এসে গেছে।...আমি কর্নেলসায়েবকে দিচ্ছি।' মিঃ মণ্ডল কর্নেলকে টেলিফোন দিয়ে বললেন, 'ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অচিন্ত্য জানা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

কর্নেল সাড়া দিয়ে বললেন, 'বলুন মিঃ জানা।...দ্যাটস রাইট। শুক্লা দাশের ডেডবডি লিগ্যাল প্রব্লেম সৃষ্টি করেছে।...আই এগ্রি।...শুনুন! টাকাগুলো আমি মিঃ সিনহার বাড়ির পেছনের গলিতে বটগাছের শেকড়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছি—এই স্টেটমেন্ট আমি দিচ্ছি। কেমন?...হ্যাঁ। দ্যাটস মাচ।...দিচ্ছি। ধরুন।'

ও. সি. প্রশান্ত মণ্ডলকে টেলিফোন দিলেন কর্নেল। একটু পরে টেলিফোন রেখে মিঃ মণ্ডল গম্ভীর মুখে বললেন, 'ঝামেলা বেড়ে গেল। আপনার অবশ্য কোনো অসুবিধে নেই। আপনি প্রদীপ সিনহার ফ্যামিলিফ্রেন্ড হিসেবে একটা সাদা কাগজে স্টেটমেন্ট লিখে দিন। কার্বন কপিতে আমি রিসিভড়

বলে সই করে দিচ্ছি। কিন্তু তারপর এতগুলো টাকা থানার মালখানায় রাখা প্রব্লেম। লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে আজই পাঠিয়ে দেব বরং।'

কর্নেলকে উনি দু শিট কাগজের ভেতর একটা কার্বন পেপার ঢুকিয়ে পিন এঁটে দিলেন। কর্নেল লিখতে থাকলেন। প্রশান্ত মণ্ডল আবার টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। 'মিসেস সিনহা? নমস্কার। আমি হেস্টিংস থানা থেকে ও. সি. প্রশান্ত মণ্ডল বলছি। আই অ্যাম সরি মিসেস সিনহা! টাকাটা আপনাকে ওভাবে হ্যান্ড ওভাব করা যাচ্ছে না। লিগ্যাল প্রব্লেম এসে গেছে।...আপনি শুনুন! ফিল্মস্টার চিত্রা দত্তের বডিগার্ড শুক্লা দাশের ডেডবডি খুঁজে পেয়েছি আমরা। কাজেই কেসটা জটিল হয়ে গেছে।...হ্যাঁ। কর্নেলসায়েবকে বলছি। উনি আপনার কাছে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলবেন।' ফোন রেখে মিঃ মণ্ডল হাসলেন। 'ভদ্রমহিলা ফায়ার! কিন্তু কী আর করা যাবে? আমার হাত-পা বাঁধা।'

কিছুক্ষণ পবে থানা থেকে বেবিয়ে গাড়িতে উঠলাম। কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, 'প্রায একটা বাজে। মালবিকার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া দরকাব। দশ মিনিটেব বেশি সময় নেব না। তুমি গাড়িতে অপেক্ষা করবে।'

ওঁর নির্দেশে ড্রাইভ করছিলাম। ক্লিফটন রোডে পৌঁছে বাঁ দিকে একটা গলির মুখে গাড়ি রাখলাম। কর্নেল ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। এখান থেকে মিঃ মুখার্জি বা প্রদীপ সিনহাব বাড়ি দেখা যায় না। ব্রিফকেসটা এখন খালি। কাজেই কোনো অস্বস্তিও নেই।

একটা সিগারেট পুড়ে শেষ হতে হতে কর্নেলকে দেখতে পেলাম। তেমনি ব্যস্তভাবে ফিরে আসছেন। রাস্তা পেবিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বললেন, 'সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, মালবিকার হুকুমে নরবাহাদুর আব ড্রাইভাব জগদীশ বাগানের শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে জড়ো করেছিল। এব ফলে আবও কিছু জায়গায় রক্তের দাগ বেবিয়ে পড়েছিল। তা ধুযে ফেলা হয়েছে। খিড়কির দরজায় নতুন একটা মজবুত তালা আঁটা হযেছে।'

'মিসেস সিনহা কী বললেন, বলুন।'

'একটু চটে গেছে। অতগুলো টাকা ফিরে পেতে অনেক ঝামেলা হবে।'

'ওঁদেব লইয়ার ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো?'

'হলো। তিরিশ-বত্রিশের মধ্যে বযস। সিনহাসায়েবকে প্রদীপদা বলতেন। বাড়ির লোক বলা চলে।'

বড় রাস্তায় গিয়ে বললাম, 'আমার ধারণা সুমন হাজরা বাচ্চুরও গার্জেন।'

'সেটা গোপালবাবু বলতে পারবেন।'

'আচ্ছা কর্নেল, চিত্রা দত্তেব গাড়ি লক্ষ্য করে কে গুলি ছুঁড়তে পারে?'

'যার পয়েন্ট থার্টি টু ক্যালিবারের ফায়ার আর্মস আছে।'

'বাচ্চু অ্যান্টিসোশ্যাল ছিল। কাজেই তার এমন একটা চোরাই অস্ত্র থাকতেই পারে।'

'তা পারে।'

'তাহলে সুমন হাজরাই ওর গার্জেন। কারণ চিত্রার সঙ্গে সিনহাসায়েবের মেলামেশা তার বরদাস্ত না হওয়ারই কথা।'

কর্নেল শুধু 'হুঁ' বলে চুপ করলেন। সারা পথ আর কোনো কথা হলো না। কারণ উনি শুধু 'হুঁ' বললেই বুঝতে পারি কথা বলার মুড নেই।...

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরলে ষষ্ঠীচরণ বলল, 'বাবামশাইকে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন। নম্বর লিখে রেখেছি। নাম বলেননি। এই দেখুন।'

ষষ্ঠী প্যাডে আঁকাবাঁকা হরফে ইংরেজিতে নাম্বারটা লিখেছে। কর্নেল ওকে বাংলা শেখানোর পর এখন ইংরেজি শেখাচ্ছেন। দেখলাম, ষষ্ঠীর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে বললেন, 'লুনা এসকর্ট সার্ভিসের নাম্বার। তার মানে মিঃ সান্যাল। পরে ফোন করা যাবে। ষষ্ঠী, আমরা খাব।'

বললাম, 'আজ আমাকে কিন্তু অফিসে যেতেই হবে। সত্যদা কথায়-কথায় শাসান, এবার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে আমার নামে কমপ্লেন করবেন। চিফ এডিটর ওঁকে বিশেষ পাত্তা দেন না।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'ক্লিফটন রোডের রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তুমি লড়ে যাচ্ছ বলে ওঁকে জানিয়ে দাও। না, না। এখন নয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। আমার মতে, খালি পেটে কর্মও হয় না। তুমি স্নান করতে চাও তো করে নাও।'

'করব। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। আপনার কথা আলাদা। সায়েবি কালচার। স্নান না করেই—'

'শাট আপ!' কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'তোমার কেন, আরও অনেকের এই অদ্ভুত ধারণা আছে, সায়েবরা স্নান করে না। ওরা সুযোগ পেলে দু বেলা স্নান করে। আমার সপ্তাহে দু-তিন দিন স্নানের পেছনে আছে পুরনো সামরিক জীবনের অভ্যাস। বেশির ভাগ সময় বনজঙ্গলে পাহাড়পর্বত মরুভূমিতে কাটাতে হয়েছে। জল পেলেও স্নানের সুযোগ পেতাম না।'

স্নান করে আমার জন্য কেনা সেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে কর্নেলের সঙ্গে সুস্বাদু লাঞ্চ সেরে নিলাম। তারপর ড্রয়িং রুমে গিয়ে দৈনিক সত্যসেবকের চিফ অব দি নিউজ ব্যুরো সত্যদাকে ফোন করলাম। কথাটা শুরু করার

সঙ্গে সঙ্গে সত্যদা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এক্সপ্ল্যানেশন লেটার টাইপ হইতাছে। বুড়ার লগে ঘুরতাছ। উনি পক্ষী খুঁজতাছেন। তুমি কী খুঁজতাছ? অ্যাঁ?'

'বিশ্বাস করলেন না? তবে শুনুন, প্রদীপ সিনহার ফিল্ম প্রোডাকশনের হিরোইনের বডিগার্ড নিখোঁজ হয়েছিল। আজ গঙ্গার ধারে তার ডেডবডি পাওয়া গেছে। এদিকে—'

সত্যদা ঝটপট বললেন, 'তুমি কোথায় আছ? গঙ্গার ধারে?'

'না। কর্নেলের বাড়িতে।'

'মিথ্যা কইয়ো না। বুড়ারে ফোন দাও।'

কর্নেলের দিকে তাকালাম। কর্নেল টেলিফোন নিয়ে বললেন, 'সত্যবাবু নাকি? কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।...কী আশ্চর্য! আমার কণ্ঠস্বর শুনেও...হ্যাঁ। জয়ন্ত ঠিকই বলছে। ওকে অন ডিউটিতে রাখুন। কিন্তু সত্যবাবু, এক্সক্লুসিভ স্টোরি পেতে হলে আপনাকে মুখ বুজে থাকতে হবে।...তা আর বলতে? তবে এক কাজ করুন, আপনাদের ফটোগ্রাফার রামবাবুকে পি জি হসপিটালের মর্গে পাঠিয়ে দিন। যে-ভাবে হোক, অভিনেত্রী চিত্রা দেবীর বডিগার্ডের ডেডবডির একটা ছবি যেন তুলে রাখেন। ওঁকেও মুখ বুজে থাকতে বলবেন।...হ্যাঁ। হ্যাঁ।' কর্নেল হাসতে হাসতে টেলিফোন রেখে দিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'লুনা এসকর্ট সার্ভিসের মিঃ সান্যালকে ফোন করবেন না?'

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, 'শুক্লার ডেডবডির খবর দিতে চেয়েছিলেন মনে হচ্ছে।'

আমি ডিভানে চিৎপাত হয়ে বললাম, 'আজ শীতটা কমে গেল।'

'কিন্তু আজ তোমার ভাতঘুম বাড়ালে চলবে না জয়ন্ত! বড়জোর আধঘণ্টা।'

'বেরুতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়ুন।'

কর্নেল চুপচাপ কিছুক্ষণ চুরুট টানার পর বললেন, 'একটা প্রশ্ন কাল রাত থেকেই আমাকে জ্বালিয়ে মারছে। শুক্লা কি নিজেই মিঃ সিনহাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য ফটোগুলো তুলেছিল? নাকি এর পেছনে অন্য কারও প্ররোচনা ছিল? শুক্লার একটা ক্যামেরা থাকতেই পারে। ছিল কিনা ওর বাবার কাছে জেনে নেওয়া যায়। কিন্তু পরের প্রশ্ন, ফিল্মটার ডেভালাপিং, ওয়াশিং এবং প্রিন্টিংও করা হয়েছিল। নেগেটিভ দেখেই সেটা বোঝা যায়। এ ধরনের গোপন এবং অশালীন ছবি বাইরে প্রিন্ট করানোর রিস্ক আছে। কাজেই খুব জানাশোনা, এমনকি এমোশনাল সম্পর্ক আছে, তেমন কাউকে দিয়ে—'

ওঁর কথার ওপর বললাম, 'শুক্লার বয়ফ্রেন্ড থাকা অসম্ভব নয়। কে বলতে পারে বাচ্চুই ওর বয়ফ্রেন্ড নয়? বাচ্চুর ফিল্মলাইনে জানাশোনা ছিল। একজন অ্যান্টিসোশ্যাল ফিল্মজগতের কোনো ফটোগ্রাফারকে দিয়ে প্রিন্ট করিয়ে নিতে পারে। সিনেমার স্টিল পিকচার যারা তোলে, কিংবা ধরুন কোনো ফিল্ম ম্যাগাজিনের ফটোগ্রাফার—যাই হোক, আপনি মূল ব্যাপারটা ছেড়ে ছবির দিকে মন দিয়েছেন কেন, আপনিই জানেন।'

কর্নেল আবার একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'কান টানলে মাথা আসে বলে একটা কথা আছে। শুক্লার ব্যাকগ্রাউন্ড যেটুকু জেনেছি, তাতে ওকে ডানপিটে আর আত্মবিশ্বাসী মনে হয়, তা ঠিক। কিন্তু প্রদীপ সিনহার মতো একজন বিজনেস ম্যাগনেটকে ব্ল্যাকমেল করা শুক্লার পক্ষে দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার নয় কি?'

'কেন? মালবিকাকে একটা প্রিন্ট দেখালেই তাঁর স্বামী কুপোকাত হয়ে যেতেন! ভদ্রমহিলাকে আপনি আমার চেয়ে ভালো চেনেন। কারণ তাঁর বাবা আপনাব বন্ধু ছিলেন। মালবিকাকে দেখে আমার কিন্তু মনে হয়েছে অসাধাবণ তেজস্বিনী মহিলা।'

কর্নেল উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকালেন। 'বাহ্! তোমার চোখ আছে ডার্লিং!'

'ঠাট্টা করছেন!'

'মোটেও না। সিরিয়াসলি বলছি। তুমি তো শুনেছ, বাবার অমতে প্রদীপ সিনহাকে বিয়ে করেছিল মালবিকা। বাবার প্রপার্টি নেয়নি। অথচ একমাত্র মেয়ে। রায়সাহেব অগত্যা তাঁর প্রপার্টি একটা ট্রাস্টিবোর্ডের হাতে দিয়ে গেছেন। ট্রাস্টিবোর্ড তাঁর উইল অনুসারে ন্যাচারাল সায়েন্স একাডেমি নামে একটা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে।' কর্নেল অ্যাশট্রেতে চুরুট গুঁজে দিলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'সে যাই হোক, পুলিশ এবং তোমার থিওরি হলো, বাচ্চুই একসঙ্গে দু-দুটো খুন করেছে। কিন্তু চিন্তা করো! শুক্লার বডি পাওয়া গেছে গঙ্গার ধারে। বাচ্চু কি কাঁধে করে শুক্লার বডি অত দূরে ফেলতে নিয়ে গিয়েছিল? তাছাড়া একটা কথা। শুক্লার বডি লোকের চোখে পড়ল পুরো একটা দিনের পরের দিন সকালে। মিঃ সিনহাকে খুন করার পর শুক্লার বডি বাচ্চুর পক্ষে কোথায় লুকিয়ে রাখা সম্ভব বলে মনে করো?'

'হ্যাঁ। এটা একটা পয়েন্ট।'

'তাছাড়া বাচ্চুর সঙ্গে এমোশনাল সম্পর্ক থাকলে শুক্লাকে সে খুন করবে কেন?'

'টাকাগুলো একা আত্মসাতের লোভে।'

'কিন্তু টাকাগুলো বাচ্চুর চোখে পড়েনি। তার স্পষ্ট প্রমাণ, লক্ষ্মী ওগুলো দৈবাৎ দেখতে পেয়ে গায়ের সোয়েটার খুলে তার ভেতর লুকিয়ে ফেলেছিল। মিঃ সিনহার ডেডবডি দেখতে পাওয়ার পর বাড়ির অন্যেরা যখন তাই নিয়ে ব্যস্ত, তখন লক্ষ্মী সোয়েটারটা কানা গলিতে বটগাছের শেকড়ের তলায় লুকিয়ে রেখে আসে।'

'লক্ষ্মী কালো প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ যোগাড় করার সময় পেল কখন?'

'নোটের বাণ্ডিল পরীক্ষা করে আমার মনে হয়েছে, মিঃ সিনহাই প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে ভরে ওগুলো শুক্লাকে দেবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আততায়ীর গুলিতে ব্যাগ হাত থেকে ছিটকে পড়ে। তাই মাত্র তিনটে বাণ্ডিলের ওপর পচা পাতা আর কাদার ছোপ লেগেছিল।'

'কিন্তু বাচ্চু খিড়কির তালা ভেঙে পালাল কেন?'

'নিশ্চয় কোনো বিশেষ কারণ ছিল। বাচ্চুকে না পেলে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'লক্ষ্মীর সঙ্গে তার যোগসাজশের কথা আপনার থিয়োরিতে ছিল!'

'ছিল। এখন থিয়োরিতে গণ্ডগোল বেধেছে।' কর্নেল হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। 'যতক্ষণ না শুক্লার বডির পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সম্পর্কে কিছু জানতে পারছি, ততক্ষণ আর নতুন কোনো থিয়োরি নয়।' বলে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন কর্নেল।...

গাড়ি স্টার্ট দিলে কর্নেল বললেন, 'আগে ভবানীপুর।'

বললাম, 'সেই বনেদি বাড়িতে তো? ব্যাপারটা খুলে বলার অসুবিধে কী?'

কর্নেল হাসলেন। 'নাহ্। আমরা এবার যাব ভবানীপুর থানায়।'

'আবার পুলিশের ডেরায়? ওঃ কর্নেল! এবার কিন্তু আপনার দুর্নাম রটে যাবে। আমার স্টোরিতে পুলিশের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা দেখে অনেকেই আমাকে চিঠি লিখে বলে, এ কীরকম রহস্যভেদী? পুলিশের সাহায্য ছাড়া কর্নেল এক পা বাড়াতে পারেন না!'

কর্নেল অমনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'ভুলে যেও না জয়ন্ত, আধুনিক সমাজব্যবস্থাটাই এরকম যে একটার সঙ্গে অসংখ্য সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে অপরাধসংক্রান্ত ব্যাপারে এ যুগে পুলিশের সাহায্য ছাড়া এগোনো খুব কঠিন। সমাজব্যবস্থার জটিলতা যত বাড়ছে, অপরাধের জটিলতাও তত বেড়ে চলেছে। তার চেয়ে বড় কথা, অনেক ক্ষেত্রে এমন একটা জরুরি তথ্যের দরকার হয়, যা পুলিশের রেকর্ড ছাড়া পাওয়া যায় না।

ইজিচেয়ারে বসে কানে শোনা বা চোখে দেখা কিছু সূত্র থেকে অপরাধী শনাক্ত করার যুগ কবে চলে গেছে। অপরাধীরা এখন প্রখর বুদ্ধি এবং মেধার অধিকারী।'

কর্নেলের বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য বললাম, 'আহা! অত বললে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কর্নেল আস্তে বললেন, 'যে তথ্যটার আশায় যাচ্ছি, তা পেয়ে গেলে আর আমাকে ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করতে হবে না।'

হেসে ফেললাম। 'সুকুমার রায়ের পদ্য। ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হলো ব্যথা!'

'ব্যথা? তা টের পাচ্ছি বটে।'

চৌরঙ্গির মোড়ে জ্যাম ছিল। ভবানীপুর থানায় পৌঁছুতে প্রায় চারটে বেজে গেল। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে কর্নেল থানায় ঢুকে গেলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি উজ্জ্বল মুখে ফিরে এসে বললেন, 'গত রাতে ভাগ্যিস অরিজিৎকে বলে রেখেছিলাম। স্বয়ং ডি সি ডি ডি-র নির্দেশ। তিন বছর আগের ফাইল মালখানা থেকে খুঁজে বের করা সহজ নয়।'

'এবার ছায়াটা কায়া হয়ে গেল তো?'

কর্নেল সিটে হেলান দিয়ে বসে চুরুট ধরালেন। 'এখনও একটু অস্পষ্টতা আছে। চলো! রেসকোর্সের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধারে ম্যান অব ওয়ার জেটির কাছে যাব।'

কোনো প্রশ্ন করলাম না। কারণ, বুঝতে পেরেছিলাম, শুক্লার লাশ যেখানে ফেলা হয়েছিল, সেই জায়গাটা দেখবেন। কিন্তু এটুকু বুঝলাম না, কেউ দেখিয়ে না দিলে উনি সঠিক জায়গাটা কীভাবে খুঁজে বের করবেন।

আজ ছুটির দিন নয়। তাই গঙ্গার ধারে ভিড়টা কম। গাড়ি লক করে কর্নেলের সঙ্গে জেটিতে নেমে গেলাম। সামনে একটা মাঝারি যুদ্ধজাহাজ নোঙর ফেলে ভাসছে। লোকেরা জাহাজটার কাছে এসে দেখছে। শীতের হাওয়াটা এখানে জোরালো। কর্নেল বাইনোকুলারে পাড়ের দিকটা দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'চলো! ফেরা যাক।'

পাড়ের কাছে গিয়ে কর্নেল চক্ররেলের লাইনের ধারে হাঁটতে হাঁটতে (তখনও হুগলিসেতু তৈরি হয়নি) একখানে থেমে আস্তে বললেন, 'ঝোপগুলোর ভেতর ডেডবডি ফেললে সহজে চোখে পড়বে না। দৈবাৎ কেউ জৈবকৃত্যে ওখানে ঢুকলে তবেই দেখতে পাবে। বাহ্! সাইট সিলেকশন খাসা! তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। আর এক হাত তফাতে ডানদিক থেকে ফেললে কিন্তু ডেডবডি জলে গড়িয়ে পড়ত। ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো সরাসরি এখানে পড়ে না। এই উঁচু আকাশমণি গাছটার জন্য।'

কর্নেলকে অনুসরণ করে গাড়ির কাছে গেলাম। বললাম, 'এবার?'

'এবার মালবিকার কাছে যাওয়া যাক। তখন কথা দিয়ে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যায় এসে ডিটেলস আলোচনা করব। স্বামীকে ফাঁদ থেকে বাঁচানোর জন্য সে আমার সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু আমি বাঁচাতে পারিনি। এই ব্যর্থতার দায় অবশ্য আমার একার নয়। সেটাই ওকে বোঝানো দরকার। মালবিকা কোনো স্পষ্ট তথ্য দিতে পারেনি। নাকি কিছু জেনেও গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছিল? এখন তো তার বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়।'

ক্লিফটন রোড এই আসন্ন সন্ধ্যায় আমার পক্ষে চেনা কঠিন হতো। কর্নেলের নির্দেশে ড্রাইভ করে ৭ নাম্বার বাড়ির গেটের সামনে দাঁড় করালাম। হর্ন শুনে নরবাহাদুর ভেতর থেকে উঁকি দিল। কর্নেল নেমে যেতেই সে ওঁকে দেখতে পেয়ে সেলাম করল। তারপর বলল, 'মেমসাব মুখার্জিসাবের সঙ্গে আভি চলে গেলেন। আপনার জন্য ওয়েট করছিলেন।'

'কখন ফিরবে বলে যায়নি?'

'না সাব!'

'আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চাই, বাহাদুর! অসুবিধা আছে?'

নরবাহাদুর হাসল। 'কুছু অসুবিধা নাই। আপনি কর্নিলসাব তিন রোজ এসেছেন। মেমসাব আমাকে ভি বলেছেন, কর্নিলসাব উনহির বাবার দোস্ত। গেট খুলিয়ে দিচ্ছি। আসুন।'

সে গেট খুলে দিলে গাড়ি লনে ঢুকিয়ে পোর্টিকোর কাছাকাছি রাখলাম। নরবাহাদুর গেটে তালা এঁটে কর্নেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিল। এই সময় পোর্টিকোর তলা থেকে মধ্যবয়সী রোগাটে গড়নের একটা লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। বাহাদুর তার উদ্দেশে বলল, 'শম্ভুদা! জলদি দো কাপ চায় লাও।'

কর্নেল এসে শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিই শম্ভু? পুরো নাম?'

শম্ভু কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে সার, শম্ভুনাথ মোহান্ত।'

বাহাদুর বলল, 'কর্নিলসাব! হলঘরে বসবেন, না বারান্দায় বসবেন?'

কর্নেল বললেন, 'পরে বসছি। ততক্ষণ একটু কথাবার্তা বলি। আচ্ছা শম্ভু, তুমি তোমার ঘর থেকে সে-রাতে বাচ্চুকে দেখেছিলে?'

শম্ভু একটু ভড়কে গিয়ে বলল, 'আজ্ঞে সার, সেইরকম মনে হয়েছিল। কুকুরটা খুব চ্যাঁচামেচি করছিল। তাই—তবে সার! মিথ্যা বলব না। স্পষ্ট দেখিনি। বিষ্টিবাদলার রাত। এদিকে ঝড়ের মতো অবস্থা।'

'কোথায় দেখতে পেয়েছিলে দেখিয়ে দাও তো!'

শম্ভু উৎসাহে পা বাড়াল। বাড়ির বাঁ দিকে দক্ষিণে মস্ত ছাতিম গাছটার তলা দেখিয়ে সে বলল, 'মনে হচ্ছে, এখানেই দেখেছিলাম। কিন্তু আলো এদিকটায় পড়ে না, দেখছেন তো সার?'

'তখন রাত কত?'

'দশটার পরে। আমি আর ড্রাইভারবাবু একসঙ্গে খেয়ে যে-যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। বাচ্চু আগেই খেয়ে শরীর খারাপ বলে তার ঘরে শুয়ে পড়েছে। তার ঘর হলঘরের ওধারে। কুকুরটা পাশের করিডরে চেনে বাঁধা ছিল।'

'কুকুরটা তো মারা পড়েছে! কে মারল?'

বাহাদুর এবং শম্ভু একসঙ্গে বলল, 'বাচ্চু!'

'বিষ খাইয়ে মেরেছে। তাই না?'

বাহাদুর বলল, 'হাঁ সার! ডাকটরসাব তাই বলেছেন।'

'কুকুরটা কি ফেলে দেওয়া হয়েছে?'

'না সার! মেমসাব ফেলে দেবেন কেন? উনি পলিথিনে প্যাক করলেন। আমি ওখানে মাটির নিচে গেড়ে দিয়েছিলাম। আজ রাজমিস্তিরি ডেকে আনলেন ড্রাইভারবাবু। গোর বাঁধিয়েছেন মেমসাব। মার্বেল পেলেটের অর্ডার দেওয়া ভি হয়েছে।' বাহাদুর দম নিয়ে ফের বলল, 'এত্তা এত্তা খুন নিকলা!'

'তা হলে গাড়ির সিট তো ধুতে হয়েছে!'

'না সার! পলিথিনে জড়িয়ে নিয়ে গেলেন মেমসাব আর মুখার্জিসাব। তো জানোয়ার যখন মুর্দা হলো, তখন গাড়ির ডিকিতে ভরে আনলেন। আমি আর ড্রাইভারদা নামিয়ে আনলাম। এত্তা খুন। সকালে ড্রাইভারদা ডিকি আচ্ছাসে ধুয়ে দিল।'

'ড্রাইভার গিয়েছিল গাড়ি নিয়ে?'

'না সার! মুখার্জিসাব গাড়ি চালিয়ে গেলেন।'

'ফিরলেন কখন?'

'রাত—তখন রাত এগারোটা—না, না। বারো বাজতে পারে।'

শম্ভু বলল, 'কী বলছ বাহাদুর? মেমসায়েবের গাড়িব হর্ন শুনে আমি তো তোমাকে ঘুম থেকে ওঠালাম। তখন প্রায় একটা বাজে।'

কর্নেল বাইনোকুলারে সম্ভবত কুকুরের কবরটা দেখছিলেন। হঠাৎ ঘড়ি দেখে বললেন, 'না। আমরা আজ বরং চলি। বাহাদুর! তোমার মেমসায়েবকে বোলো কাল সকালে ফোনে কথা বলব। চলো জয়ন্ত!'

রাস্তায় পৌঁছে কর্নেল বললেন, 'তুমি এগিয়ে সেই গলির মুখে গাড়ি রাখো। ওই যে—ডাইনে।'

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'এখনই আসছি। মিঃ মুখার্জির দারোয়ান ফাগুলালকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে আসব।'

কর্নেলকে নামিয়ে দিয়ে গলিটার দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রায় দশ মিনিট

পরে কর্নেল ফিরে এসে বললেন, 'চলো! আজকের মতো এই যথেষ্ট। বাড়ি ফিরে কড়া কফি খাওয়া যাক।'

'ফাগুলালের কাছে কী ব্যাপার?'

'ওঃ জয়ন্ত! এখন কোনো কথা নয়।'

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ষষ্ঠীচরণকে কফির হুকুম দিয়ে টুপি খুললেন। টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'হেস্টিংস এরিয়ায় কিন্তু বেশ শীত। আর এখানে কেমন যেন গরম আবহাওয়া। না, না। ফ্যান চালাতে বলছি না। চুপচাপ বসে কফির অপেক্ষা করো। কফি ঝিমিয়ে পড়া নার্ভকে চাঙ্গা করে।'

ষষ্ঠী এইসময় পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'বাবামশাই! বলতে ভুলেছি। দুপুরের সেই নম্বরে আবাব ফোন এসেছিল। বললাম, বাবামশাই নেই।'

'আগে কফি।'

ষষ্ঠী অদৃশ্য হলো। কর্নেল চোখ বুজে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সোজা হয়ে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। ডায়াল করার পর সাড়া পেয়ে বললেন, '...আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ও. সি. মিঃ মণ্ডল আছেন?...হ্যাঁ, ওঁকে দিন।' কিছুক্ষণ কাঁধে রিসিভার আটকে রাখার পর বললেন, 'মিঃ মণ্ডল? আমি কর্নেল...শুনুন! শুক্লা দাশের পোস্টমর্টেমের প্রাইমারি রিপোর্টে কী বলা হয়েছে?...পয়েন্ট থার্টি টু ক্যালিবার? মানে, একই রিভলভাবের গুলি?...হ্যাঁ। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে তো নয়ই। শুক্লা পালিয়ে যাচ্ছিল। তাই পিঠে গুলি লাগে।...ঠিক আছে।...বাচ্চু পাকড়াও না হলে কেস দাঁড় করানো যাবে কি?...হ্যাঁ। আমিও তাই বলছি। আচ্ছা। ধন্যবাদ!'

ষষ্ঠী কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে এল ট্রেতে। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে আমার দিকে হাসিমুখে তাকালেন। 'চিযার আপ জয়ন্ত! চিয়ার আপ!'

'হঠাৎ এত উল্লাসেব কারণ কী?'

'কফি। ষষ্ঠী অসাধারণ কফি করে।'

'তা করে। কিন্তু আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সিনহাসায়েবের হত্যাবহস্যের সমাধান কবে ফেলেছেন!'

কর্নেল হাসলেন। 'নাহ্। ওই যে মিঃ মণ্ডলকে টেলিফোনে বলছিলাম। বাচ্চুকে না পেলে কেস দাঁড় কবানো যাবে না।'

'কেন?'

'ওসব কথা এখন থাক। কফি খাও জয়ন্ত! নার্ভ চাঙ্গা করো।' বলে কর্নেল কফিতে চুমুক দিলেন। ওঁর চোখে-মুখে উজ্জ্বলতা ঝলমল করছিল।

হঠাৎ মনে হলো, আইনজীবী এস. কে. মুখার্জির দারোয়ান ফাগুলালের কাছেই কি কর্নেল নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়ে গেছেন? কর্নেল বরাবব বলেন, অনেক সময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি। ফাগুলাল কি এমন কোনো কথা ওঁকে বলেছে, যাব গুরুত্ব সে নিজেই জানে না?...

।। আট ।।

কফি শেষ করে কর্নেল চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, 'লুনা এসকর্ট সার্ভিসের রথীন্দ্র সান্যাল দুবার টেলিফোন করেছেন। এবার ওঁকে রিং করা যেতে পারে। আমার ধারণা, ওঁর এজেন্সির সুনামহানির আশঙ্কাতেই উনি আমাকে কাজে লাগাতে চান। বুঝলে জয়ন্ত? গোয়েন্দাগিরির প্রস্তাব দিলে আমি কিন্তু ফি চাইব। কত চাওয়া যায় বলো তো?'

ওঁর পরিহাসের মেজাজ লক্ষ্য করে বললাম, 'পঞ্চাশ হাজার টাকা।'

'ঠিক বলেছ!' কর্নেল হাসিমুখে নাম্বারটা ডায়াল করতে থাকলেন। তারপর সাড়া পেয়ে বললেন, 'মিঃ সান্যাল আছেন?...কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। বলুন মিঃ সান্যাল! আপনি দুবার রিং করেছিলেন শুনলাম।...অজন্তা স্টুডিয়ো?...বলেন কী!...ফটোগুলো আপনি নষ্ট করে দিন। বিপদে পড়বেন কিন্তু!...কী নাম ছেলেটির?...না, না। এটা চেপে যান। কারণ ফটোর মেয়েটির পলিটিক্যাল গার্জেন আছেন। সাংঘাতিক লোক। আপনি কি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুমন হাজরার নাম শুনেছেন?....তা হলে বুঝতেই পারছেন। আর শুনুন, শমীক নামে ছেলেটিকে সতর্ক করে দিন।...হ্যাঁ। ওকে বলুন, ব্যাপারটা জানাজানি হলে শুধু পুলিশ নয়, সুমনবাবুর মস্তানবাহিনী এসে স্টুডিয়ো জ্বালিয়ে দেবে।...চমৎকার কাজ করেছেন। আপনি বুদ্ধিমান।...শুক্লার খুনীকে খুব শীগগির ধরা হবে। জাস্ট্ ওয়েট অ্যান্ড সি।...যাই হোক, ভাগ্যিস আপনি আর কাউকে না জানিয়ে শুধু আমাকে জানালেন! ধন্যবাদ।'

কর্নেল টেলিফোন রেখে আমার দিকে তাকালেন। বললাম, 'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ। শুক্লার মৃত্যুতে তার বয়ফ্রেন্ড শমীক স্বভাবত শোকগ্রস্ত। সে লুনার কাছাকাছি একটা সাধারণ স্টুডিয়োর কর্মচারী। শুক্লা তার কাছে গোপনে একটা ক্যামেরা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর নেগেটিভ ফিল্ম প্রিন্ট করতে দিয়েছিল। বয়ফ্রেন্ড মানে প্রেমিক তো বটেই। প্রেমিক ছেলেটি ফিল্ম ডেভালাপ করে একসেট প্রিন্ট নেগেটিভসহ শুক্লাকে দেয়। শুক্লার অজ্ঞাতসারে নিজে আরেক সেট প্রিন্ট নিজের কাছে রাখে। শুক্লার খুন হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে সে একটা কিছু আঁচ করে মিঃ সান্যালের শরণাপন্ন হয়েছিল।'

'ফিল্মস্টার চিত্রা দত্তকে কি ওরা চিনতে পেরেছে?'

'নাহ্। চিনতে পারলে আমাকে মিঃ সান্যাল নামটা বলতেন।' বলে কর্নেল একটু হাসলেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! গত রাতে পার্ক লেনে গিয়ে লুনা এসকর্ট সার্ভিস খুঁজে বের করার পর আমি কেন যেন পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'আপনি তা বলেছেন আমাকে।'

'ইনট্যুইশন! আশ্চর্য জয়ন্ত, সত্যি আশ্চর্য! আমি অজন্তা স্টুডিয়োর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর মুনলাইট বারে গিয়ে ঢুকেছিলাম। এখন মনে পড়ছে, আমি অজন্তা স্টুডিয়ো আর লুনার কর্মী শুক্লা দাশের যোগাযোগের সম্ভাবনা নিয়ে একটু চিন্তাও করেছিলাম।'

'আপনি বরাবর দেখেছি, ইনট্যুইশনে বিশ্বাসী।'

'ঠিক বিশ্বাস নয়, অস্পষ্ট একটা ধারণা। অনেক মানুষের মধ্যে এই আশ্চর্য বোধটা কাজ করে।' কর্নেলকে হঠাৎ একটু উত্তেজিত দেখাল। 'জয়ন্ত! শুক্লার মধ্যেও কি এমন কোনো বোধ কাজ করেছিল? আক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তে সে-ই কি নলে নেগেটিভ ফিল্মভর্তি টয় পিস্তলটা পাঁচিলের ওধারে ছুঁড়ে ফেলেছিল? হ্যাঁ—এটা সম্ভব। খুবই সম্ভব। টয় পিস্তলটা দৈবাৎ পচা পাতা আর জলভর্তি একটা গর্তে গিয়ে পড়েছিল—এটা কি হতে পারে না?'

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। একটু পরে বললাম, 'আজ রাতে যদি আর কোথাও না বের হন, আমি সল্টলেকে ফিরব।'

কর্নেল চোখ বুজেই বললেন, 'না। আর কোথাও বেরুনোর দরকার নেই।'

'তা হলে আমি উঠছি।'

'হ্যাঁ। বুঝতে পারছি তুমি কুনিদ্রার ভয়ে পালাতে চাইছ। আমার ডেরায় রাত কাটালে তোমার সুনিদ্রার চান্স নেই। ঠিক আছে। অদ্য শেষ রজনী। ফ্ল্যাটে ফিরে সুনিদ্রা উপভোগ করো। হ্যাভ এ নাইস স্লিপ ডার্লিং! গুডনাইট।'...

সকালে ঘুম ভাঙার পর হঠাৎ কর্নেলের কথাটা মনে পড়েছিল, 'অদ্য শেষ রজনী'। তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুম সেরে চা খাওয়ার পর কর্নেলকে ফোন করলাম। ষষ্ঠীচরণের সাড়া পেলাম। 'দাদাবাবু! বাবামশাই এখনও নামেননি।'

'ছাদের বাগান থেকে?'

'আজ্ঞে। গিয়ে বলব নাকি?'

'না। আমি দশটার মধ্যে যাচ্ছি। আচ্ছা ষষ্ঠী, তোমার বাবামশাই গত রাতে আবার বেরিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ দাদাবাবু! খাওয়ার পর এক পুলিশ অফিসার এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। ফিরলেন রাত একটায়।'

'ঠিক আছে। রাখছি।'

কর্নেলের 'অদ্য শেষ রজনী' কথাটা আবার আমাকে উত্তেজিত করল। ব্রেকফাস্ট করে তখনই বেরিয়ে পড়লাম। দশটার আগেই পৌঁছে গেলাম কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে।

কর্নেল আমাকে দেখে বললেন, 'আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে জয়ন্ত! তোমাকে ফ্রেশ দেখাচ্ছে।'

'আপনাকেও। তো আমি পুলিশের সঙ্গে আপনার নৈশ অভিযানের খবর পেয়ে গেছি।'

কর্নেল হাসলেন। 'তুমি ফোন করেছিলে। ষষ্ঠী বলেছে।'

'কোথায় বেরিয়েছিলেন?'

'হেস্টিংস থানায়। বাচ্চুকে পুলিশ তাব গ্রামের বাড়ি থেকে ধবে এনেছে। বাচ্চুর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। এদিকে আজ ভোর ছটায় মালবিকা আমাকে রিং করে জানাল, কাল সন্ধ্যা ছটায় গ্র্যান্ড হোটেলে ওদেব কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের জরুরি মিটিং ছিল। মিটিং শেষ হতে বাত এগারোটা বেজে যায়। তাই বাড়ি ফিবে আব আমাকে রিং করেনি। আমি ওকে বলেছি, সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আমি যাচ্ছি।'

ঘড়ি দেখে বললাম, 'তাহলে তো এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত।'

'তুমি অধৈর্য হয়ে পড়ছ দেখছি!'

'কারণ গত রাতে আপনি বলেছেন, অদ্য শেষ রজনী!'

কর্নেল একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'হ্যাঁ। সেটাই হয়েছে সমস্যা। একটা করে মিনিট কেটে যাচ্ছে, একটু করে উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। চূড়ান্ত বিস্ফোবণেব জন্য এ যেন কাউন্টডাউন।' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আলমারি খুলে সেই ব্রিফকেসটা নিয়ে এলেন। তারপর সেটা টেবিলে বেখে ইজিচেয়াবে বসলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্রিফকেসে তো আজ টাকা নেই। অন্য কিছু আছে। তাই না?'

'তোমার অনুমান করা উচিত।'

'নেগেটিভ ফিল্ম, প্রিন্টগুলো, টয় পিস্তল ইত্যাদি।'

'হ্যাঁ। ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন শুধু একটা জরুরি ফোনের প্রতীক্ষা।'

'লক্ষ্মীরানীকে গ্রেফতার করার খবর আসবে বুঝি?'

কর্নেলের গাম্ভীর্য ভাঙচুর হলো হা হা হাসিতে। 'ওঃ জয়ন্ত! বরাবব তোমাকে বলে আসছি, তোমাকে দক্ষ রিপোর্টার হতে হলে চাই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে।

হাসি থামিয়ে কর্নেল বললেন, 'কাল অনুপমা—মানে সিনহাসায়েবের বাড়িতে তুমি মুখ তুললেই দেখতে পেতে, লাল সোয়েটার পরে লক্ষ্মীরানী পোর্টিকোর ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা এগিয়ে যেতেই সে ভেতরে অদৃশ্য হলো।'

'মেয়েটি দেখছি বেপরোয়া!'

'এতে বেপরোয়া হওয়ার কিছু নেই। কারণ কোনো লাল সোয়েটারের কথা পুলিশকে আমি বলিনি। খুনের রাতে পুলিশ লক্ষ্মীকে যা জিজ্ঞাসাবাদ করার, তা করেছে। এখন মেডসারভ্যান্ট ছুটি নিয়ে বাবা-মায়ের কাছে যেতেই পারে। গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছে। বরং না ফিরলেই পুলিশ ওকে সন্দেহ করবে, হয়তো কিছু জানে। এটা আঁচ করেই সে ফিরে এসেছে।'

'ধড়িবাজ মেয়ে।'

'হ্যাঁ। তাতে কোনো ভুল নেই।'

এতক্ষণে টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। তারপর হ্যাঁ হুঁ করে গেলেন ক্রমাগত। ফোন রেখে আমার দিকে তাকালেন। তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'কার ফোন?'

'লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের এস আই মুকুল বিশ্বাস। বিডন স্ট্রিটে তারকবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন শুক্লার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কাগজপত্র দেখতে। তারকবাবু সহযোগিতা করেছেন। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুক্লার পাস বইয়ে নগদ দশ হাজার টাকা, দ্বিতীয় সপ্তাহে পনের হাজার টাকা জমা পড়েছে। তার মানে, ব্ল্যাকমেলিংয়ের যা নিয়ম। স্টেপ বাই স্টেপ টাকার অঙ্ক বাড়তে থাকে। অগত্যা বাধ্য হয়ে প্রদীপ সিনহা পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা দিয়ে নেগেটিভ ফিল্ম ফেরত পাওয়ার জন্য রফা করেছিলেন। চলো, এবার বেরুনো যাক। ষষ্ঠী! আমরা বেরুচ্ছি!'...

নিচের লনে গিয়ে কর্নেল বললেন, 'কিন্তু শুক্লার কাছে ছবির প্রিন্ট থেকে যেতে পারে, এ চিন্তা কেন করেননি প্রদীপ সিনহা? সেই প্রিন্টের জোরে আবার শুক্লা তাঁকে ব্ল্যাকমেল করে যেত। প্রদীপ সিনহার মতো মানুষ কেন একথা চিন্তা করেননি?'

বললাম, 'আপনি কি এ বিষয়ে আমার মত জানতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ!' বলে কর্নেল গাড়িতে উঠলেন।

স্টার্ট দিয়ে বললাম, 'কোনো আতঙ্কের কারণ ছিল। আতঙ্ক মানুষকে হঠকারী করে।'

'হুঁউ।' বলে কর্নেল চুপ করে গেলেন। সারা পথ একেবারে চুপ। ধ্যানস্থ।...

৭ নাম্বার ক্লিফটন রোডের বাড়ি 'অনুপমা'-র সামনে একটা পুলিশভ্যান এবং লাল জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। গেটের সামনে এবং পাশে ফুটপাতের

ওপর কয়েকজন কনস্টেবল জটলা করছিল। দেখেই চমকে উঠেছিলাম। আবার কোনো খুনখারাপি ঘটেছে নাকি?

কর্নেলের নির্দেশে বাইরে পুলিশভ্যানের কাছে গাড়ি দাঁড় করালাম। বললাম, 'নিশ্চয় আবার কিছু ঘটেছে!'

কর্নেল জবাব দিলেন না। নরবাহাদুর তাঁকে দেখে সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিল। তাব মুখে উদ্বেগ লক্ষ্য করলাম। পোর্টিকের নীচে থানার অফিসার-ইন-চার্জ প্রশান্ত মণ্ডল এবং আরও দুজন অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেলকে দেখে মিঃ মণ্ডল অভিবাদন জানিয়ে আস্তে বললেন, 'মিসেস সিনহা চটে গেছেন। সাড়ে এগারোটায় নাকি ওঁদের কোম্পানির হেডঅফিসে জরুরি মিটিং। ওঁকে বলেছি, কর্নেলসায়েব এলে আপনি যেতে পারবেন।'

'এস. কে. মুখার্জির খবর কী?'

'উনি ম্যাডামের কাছে আছেন।'

'চলুন। ভেতরে যাওয়া যাক।'

নিচের হলঘরে আমবা ঢুকলাম। একটু পরে মুখার্জিসাযেব নেমে এসে বললেন, 'আপনাবা বসুন। মিসেস সিনহা এখনই আসছেন। আসলে উনি খুব উত্তেজিত হযে উঠেছেন। বুঝতেই পারছেন, মিঃ সিনহার কোম্পানির অবস্থা সম্পর্কে শিগগির সবকিছু দেখেশুনে সিদ্ধান্ত না নিলে উনি প্রতারিত হতে পারেন।' তিনি ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হেসে কর্নেলকে বললেন, 'কর্নেলসাযেব কি মিঃ সিনহার কিলারকে ধরিয়ে দিতে এসেছেন?'

কর্নেল চুরুট বের কবে বললেন, 'আপনাব কী মনে হচ্ছে?'

'হঠাৎ পুলিশফোর্স এসে বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলেছে লক্ষ্য কবলাম। মিঃ মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করলে উনি বললেন, ওঁরা কর্নেলসায়েবেব অপেক্ষা করছেন। আমি জানি না, কর্নেলসায়েবের এ ব্যাপারে লিগ্যাল স্ট্যাটাস কী।'

কর্নেল হাসলেন। 'আপনি কি চান না মিঃ সিনহার কিলার ধরা পড়ুক?'

'অবশ্যই চাই। আমি এখন মিসেস সিনহার অ্যাটর্নি। লিখিতভাবে এবং কোর্টে অ্যাফিডেবিট করে উনি আমাকে অ্যাটর্নির দায়িত্ব দিযেছেন। কাজেই আমি ওঁর নিরাপত্তার জন্য স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন।'

এই সময় মালবিকা সিনহাকে সিঁড়িতে দেখা গেল। রুষ্ট মুখে নামতে নামতে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কিছু। কর্নেল! এসব কী হচ্ছে? আমার বাড়ির লোকেদের পর্যন্ত বেরুতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করার পর বেরুতে যাচ্ছিলাম। আমাকে বলা হলো, আপনি না আসা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে।'

কর্নেল বললেন, 'বসো মালবিকা! নরহত্যা বড় নির্মম ঘটনা। কাজেই আইনরক্ষকদের নির্মম হতে হয়। আমি অবশ্য আইনরক্ষক নই। তোমার

বাবার একসময়ের বন্ধু। তাছাড়া তুমি তোমার স্বামীকে বাঁচানোর জন্য আমার সাহায্য চেয়েছিলে। আমি তোমার স্বামীকে বাঁচাতে পারিনি। সেই ব্যর্থতা আমার দায়িত্ব একটু বাড়িয়ে দিয়েছে, এই যা। তুমি বসো! তারপর আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দাও। আশা করি, তুমি সঠিক উত্তর দেবে।'

মালবিকা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বলল, 'বলুন।'

'অভিনেত্রী চিত্রা দত্তের সঙ্গে তোমার স্বামীর অশালীন অবস্থার কোনো ফটো কি তুমি দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ। কেউ ওটা ডাকে আমার নামে পাঠিয়েছিল।'

'তারপর তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলে। তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তাই আপনাকে—'

'বুঝতে পারছি, শালীনতাবশে তুমি সেটা আমাকে দেখাওনি। শুধু বলেছিলে, তোমার স্বামী কোনো বিপজ্জনক ফাঁদে পা দিয়েছে। তোমার স্বামী খুন হয়ে যাওয়ার পরে অবশ্য তুমি অভিনেত্রী চিত্রার কথা আমাকে বলেছিলে।' বলে কর্নেল তাঁর ব্রিফকেস খুললেন। একটা ফুলস্কেপ সাইজের কাগজ বের করলেন। 'মালবিকা! তোমার বাবা অশোক রায় যৌবনে বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হওয়ার পর তিনি একটা রাইফেল ক্লাব গড়ে তোলেন। তোমাকে তার মেম্বার করেছিলেন। তুমি একবার সারা ভারত রাইফেল ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলে।'

মালবিকা বলল, 'এ সব কথা কেন?'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমার বাবা অশোক রায়ের রাইফেলের লক্ষ্যভেদ ছিল অব্যর্থ। কোথাও গুণ্ডা হাতিকে মেরে ফেলার দরকার হলে সরকার তোমার বাবার সাহায্য নিতেন। ওড়িশার জঙ্গলে একটা গুণ্ডা হাতিকে গুলি করার সময় খাদে পড়ে তিনি ভীষণ আহত হয়েছিলেন। তারপর বাকি জীবনের জন্য তিনি পঙ্গু হয়ে যান। তিন বছর আগের কথা। সেই সময় প্রদীপ সিনহার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়। প্রদীপ সিনহা তোমাকে ফিল্মে অভিনয়ের চান্স দিয়েছিলেন। তোমার বাবা তোমার এ ধরনের কেরিয়ার পছন্দ করেননি। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তোমার বিরোধের সূত্রপাত।'

'কিন্তু আপনি বলতে চান কী? আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি ছিলে জেদি মেয়ে। প্রদীপ সিনহাকে তুমি বাবার অমতে বিয়ে করেছিলে। অশোকবাবুও ছিলেন জেদি মানুষ। সেই বিয়ে তিনি মেনে নেননি। তুমি বাড়ি থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলে। তার কিছুদিন পরে অশোকবাবু—তিনি রায়সায়েব নামে পরিচিত ছিলেন—তাঁর সব সম্পত্তি প্রকৃতি বিজ্ঞান সংস্থাকে উইল করে দেন। তাঁর দুটি রাইফেল আর একটি শটগান ছিল। একটা আর্মস কোম্পানিকে বিক্রি করেন। কিন্তু তাঁর একটা রিভলভার

চুরি হয়েছিল। কবে চুরি হয়েছিল, তিনি জানতে পারেননি। ভবানীপুর থানায় তিনি লিখিতভাবে তা জানিয়েছিলেন। এই কাগজটা থানার জেনারেল ডায়রির কপি।'

মালবিকা ফুঁসে উঠল, 'আপনি কেন এসব কথা বলছেন?'

কর্নেল একই সুরে বললেন, 'তোমাদের বাড়ির পুরাতন ভৃত্যই বলা চলে—বিশ্বনাথ ওরফে বিশু সেই প্রকৃতিবিজ্ঞান সংস্থায় তোমার বাবার ইচ্ছা অনুসারে চাকরি পেয়েছিল। দু দিন আগে তার সঙ্গে দেখা করেছি। সে আমাকে অকপটে জানিয়েছে, রিভলভারটা তুমিই নিয়ে এসেছিলে। সে দেখেছিল, কিন্তু রায়সায়েবকে বলতে সাহস পায়নি।'

মিঃ মুখার্জি বাঁকা হেসে বললেন, 'আপনার বলার উদ্দেশ্য মিসেস সিনহা তাঁর স্বামীকে সেই রিভলভার দিয়ে খুন করেছেন?'

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, 'হ্যাঁ। শুধু সিনহাসায়েবকে নয়, চিত্রা দত্তের বডিগার্ড শুক্লাকেও। কারণ শুক্লা মালবিকাকে রিভলভার হাতে দেখতে পেয়েই বেগতিক বুঝে পালানোর চেষ্টা করছিল। মালবিকা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়নি। হ্যাঁ—শুক্লার হাতে একটা ফায়ার আর্মস হিসেবে যেটা ছিল, সেটা এই টয় পিস্তল।' কর্নেল টয় পিস্তলটা বের করে দেখালেন। 'এর নলে লুকোনো ছিল প্রদীপ সিনহা আর চিত্রা দত্তের অশালীন অবস্থার কয়েকটি ফটোর নেগেটিভ। চরম মুহূর্তে সে এটা পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছিল।'

দেখলাম, মালবিকা ঠোঁট কামড়ে ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। মিঃ মুখার্জি বললেন, 'আপনি এ সব কথা প্রমাণ করতে পারবেন তো কর্নেলসায়েব?'

কর্নেল শক্ত মুখে বললেন, 'পারব। অ্যালসেশিয়ান জিমিকে বিষ খাইয়ে মারলে তবেই শুক্লা দাশের রক্তাক্ত ডেডবডি সেই সুযোগে নিরাপদে বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়। মালবিকার গাড়ির ডিকিতে শুক্লার ডেডবডি লুকানো ছিল। তাই ডিকিতে প্রচুর রক্তের দাগ ছিল। মরা কুকুরের রক্ত বলে শুক্লার রক্ত বাড়ির লোকেদের দিয়ে ডিকি ধুয়ে ফেলা সহজ হয়ে ওঠে। জোর দিয়ে বলছি, ডিকিতে শুক্লার রক্তের দাগ কারও সন্দেহের উদ্রেক না করে ধুয়ে ফেলার জন্যই জিমিকে বিষ খাইয়ে মারার দরকার হয়েছিল।'

মিঃ মুখার্জি বাঁকা হেসে বললেন, 'প্রমাণ করতে পারবেন না কর্নেলসায়েব! বেহালার ডগ হসপিট্যালের ডাক্তার পি. কে. বাগচি জানেন—'

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি এবং মালবিকা রাত দশটায় ডগ হসপিট্যাল থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু এ বাড়ির লোকেরাই বলেছে, আপনারা গাড়ি নিয়ে ফেরেন রাত প্রায় একটায়।'

প্রশান্ত মণ্ডল বললেন, 'আমরা বেহালা ডগ হসপিট্যালে খোঁজ নিয়েছি।'

মিঃ মুখার্জি চার্জ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'আমাদের ফিরতে দেরি হওয়ার কারণ ছিল। কোর্টে তা বলব। কিন্তু কর্নেলসায়েব যে রিভলভারের কথা বলছেন, সেটাই যদি মার্ডার উইপন হয়—'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। মার্ডার উইপন। রায়সায়েবের চুরি হয়ে যাওয়া রিভলভারটা ছিল পয়েন্ট থার্টি টু ক্যালিবারের। পিঙ্কিনস্টন কোম্পানির তৈরি রিভলভার। নাম্বারও এই পুলিশ ডায়েরিতে লেখা আছে।'

'বেশ তো! সার্চ করে দেখুন, রিভলভারটা পান কি না।' আইনবিদ তেমনি ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'গঙ্গার জলে ছুড়ে ফেলে দিলে অবশ্যি পাওয়া যাবে না।'

'পাওয়া যাবে। কারণ মালবিকা যার সাহায্য নিয়ে শুক্লা দাশের লাশ তার গাড়ির ডিকিতে ঢুকিয়েছিল, তার মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করতে আর একটা গুলি খরচের দরকার ছিল।'

'লোকটি কে জানতে পারি?'

'স্বপন ঘোষ ওরফে বাচ্চু। বাচ্চু ঘটনার পরের রাতে পেছনের দরজার তালা ভেঙে পালিয়েছিল। তার কারণ, সে আড়ি পেতে শুনেছিল, আপনি এবং মালবিকা তাকে খতম করে তার লাশ কীভাবে শুক্লার মতো গঙ্গার ধারে ফেলে দিয়ে আসবেন, তার চক্রান্ত করছিলেন। আর হ্যাঁ—বাচ্চুকে মালবিকা এক হাজার টাকা বখশিস দিয়েছিল অবশ্য। তবে এ-ও ঠিক, বাচ্চু মূলত একজন অ্যান্টিসোশ্যাল। সে মালবিকাকে ব্ল্যাকমেল করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সে ধূর্ত। তাই পালিয়ে গিয়েছিল।'

প্রশান্ত মণ্ডল বললেন, 'রাঁধুনি শম্ভু মোহান্ত ঘটনার রাতে বাচ্চুকে সত্যিই দেখতে পেয়েছিল। বাচ্চু আমাদের বলেছে, সে ঘুমোয়নি। তার ঘরের একটা জানালা খোলা ছিল। জানালাটা থেকে এই হলঘরের দরজা পর্যন্ত দেখা যায়। কুকুরের ডাকে সে সন্দেহবশে জানালায় উঁকি দেয়। সিনহাসায়েবকে চুপিচুপি বেরিয়ে যেতে দেখে। তার একটু পরেই মিসেস সিনহাকে যেতে দেখে সে আরও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। তার বক্তব্য, সায়েব-মেমসায়েব ক'দিন ধরে তর্কাতর্কি বা ঝগড়াও করছিলেন। তাই সে বেরিয়ে গিয়ে ছাতিম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। সিনহাসায়েব মালবিকাকে হঠাৎ ঘুরে দেখতে পান। তাই তাঁর মাথার বাঁ দিকে গুলি লাগে। তিনি পড়ে যান। তারপর—'

মিঃ মুখার্জি বললেন, 'ওসব স্টেটমেন্ট বাচ্চুর। কোর্ট পুলিশের কাছে দেওয়া স্টেটমেন্ট গ্রাহ্য করবে না। পুলিশ অফিসার হিসেবে নিশ্চয় আপনার তা জানা আছে। মার্ডার উইপন যতক্ষণ না আমার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারছেন, ততক্ষণ এসব নিতান্ত সারক্যামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স মাত্র। এতে কোনো সুবিধে হবে না।'

কর্নেল ব্রিফকেসে টয় পিস্তল এবং সেই পুলিশ ডায়রির কপি ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রশান্ত মণ্ডল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সার্চ ওয়ারেন্ট আমরা এনেছি। আমরা প্রথমে মিসেস সিনহার ঘর সার্চ করতে চাই।'

কর্নেল বললেন, 'রিভলভারটা কোথায় লুকানো আছে আমি জানি।'

মিঃ মণ্ডল একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায় আছে?'

কর্নেল একটু হাসলেন। 'বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি পিঙ্কিনস্টন। তাদের তৈরি ফায়ার আর্মসের মূল্য মালবিকা বোঝে। তা ছাড়া বাচ্চুর জন্যও ওটা দরকার ছিল। তাই নিরাপদ জায়গায় অস্ত্রটা লুকিয়ে রাখতে হয়েছে। এমন একটা জায়গায়, যেখানে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, একটা ফায়ার আর্মস আছে। তার আগে আমাকে রায়সায়েবের মতোই নির্মম হতে হচ্ছে। একটা নরহত্যা নির্বিবাদে যাতে করা যায় এবং কোনো সন্দেহ না জাগে, তার জন্য মালবিকা আমার সাহায্য চাইতে গিয়েছিল অর্থাৎ আমাকে এক্সপ্লয়েট করে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে চেয়েছিল—এটা আমার পক্ষে অপমান-জনক। কাজেই মালবিকা আর তার সহচর শচীশকুমার মুখার্জিকে আমি দু-দুটো খুনের দায়ে গ্রেফতারের অনুরোধ জানাচ্ছি। মিঃ মণ্ডল!'

মুখার্জিসায়েব এবং মালবিকার দুপাশে দুজন পুলিশ অফিসার গিয়ে দাঁড়ালেন।

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে বললেন, 'মিঃ মণ্ডল! বাগানের কোণে কুকুরের কবরটা খুঁড়লেই মার্ডার উইপনটা পেয়ে যাবেন। এখনই খুঁড়ে ফেলার ব্যবস্থা করুন!'...

ফেরার সময় কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মার্ডার উইপন কুকুরের কবরে লুকানো আছে, তা কেমন করে জানলেন?'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'কাল সন্ধ্যার আগে বাইনোকুলারে দেখছিলাম, কুকুরের কবরে মার্বেল ফলক বসানোর জায়গাটা ফাঁকা রাখা হয়েছে। তার মানে, প্রয়োজনে রিভলভারটা তুলে নিতে হলে ফলকটা সরানোই যথেষ্ট। পলিথিনে মোড়া কুকুরের মড়া। কাজেই যখন খুশি অস্ত্রটা তুলে নেওয়া যেত। তবে ব্যাপারটা স্রেফ অঙ্ক, জয়ন্ত! আগাগোড়া একটা ভগ্নাংশের অঙ্ক। তবে দৃশ্যটা কল্পনা করো! কবরের অন্ধকারে একটি মৃত্যুর পাশে আরও একটি মৃত্যুর বীজ যেন—ওই পিঙ্কিনস্টন রিভলভার।'...

শঙ্খচূড়ের ছায়া

সদাশিব চক্রবর্তী ঘরে ঢুকে বললেন, কর্নেল সায়েবের কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলুম। আপনি বিজ্ঞ বহুদর্শী মানুষ। নানারকমের অভিজ্ঞতা আছে।

তিনি সোফায় বসে তারপর আমাকে দেখতে পেলেন। আরে! জয়ন্তবাবুও আছেন দেখছি। ভালই হলো। সাংবাদিকরাও অনেকরকম খবরাখবর রাখেন। আপনিও বলুন।

চক্রবর্তীমশাই কর্নেলের প্রতিবেশী এবং তাঁর সমবয়সী। হাইকোর্টের দুঁদে অ্যাডভোকেট ছিলেন। এখন আর প্র্যাকটিস করেন না। এই শীতে তাঁর পরনে গলাবন্ধ ওভারকোট এবং পাজামা। হাতে একটা কালো ছড়ি। মাথায় মাফলার জড়ানো।

কর্নেল খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ভাঁজ করে রেখে বললেন, বলুন চক্রবর্তীমশাই!

সদাশিব চক্রবর্তী বললেন, কথাটা হলো, শীতকালে সরীসৃপেরা শুনেছি গর্তের ভেতর ঘুমিয়ে থাকে। এটা নাকি তাদের হাইবারনেশন পিরিয়ড। তাই না?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আপনার প্রশ্নটা কী?

প্রশ্নটা হলো, সাপও তো সরীসৃপ। কিন্তু শীতকালে সাপের কামড়ে মৃত্যু তাহলে অস্বাভাবিক কিনা?

সব কিছুতেই ব্যতিক্রম আছে চক্রবর্তীমশাই! ধরুন, যে গর্তে কোনো বিষাক্ত সাপ ঘুমোচ্ছে, দৈবাৎ কেউ সেখানে হাত ঢোকালে বা পা পড়লে সহজাত প্রবৃত্তিবশে সাপটা ছোবল দেবেই।

বুঝলুম। কিন্তু খটকা থেকে যাচ্ছে।

কেন?

চক্রবর্তীমশাই হাসলেন। সাপ কি ড্রাকুলার মতো গলার পাশে দাঁত বসায়?

কর্নেল তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম, ধরুন। এমন তো হতেই পারে। যাকে সাপে কামড়েছে, সে দৈবাৎ পা হড়কে ঘুমন্ত সাপের কাছে এমন অবস্থায় পড়েছিল, যাতে সাপ তার গলার অংশটাই নাগালে পেয়েছিল।

চক্রবর্তীমশাই মাথা নেড়ে বললেন, নাহ্। তবু খটকা থেকে যাচ্ছে। কারণ পরদিন আরও একজন বিষাক্ত সাপের কামড়ে মারা গেল এবং তারও গলার পাশে ঠিক ড্রাকুলার কামড়ের মতো দুটো ক্ষতচিহ্ন। একই এরিয়ায়।

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, চক্রবর্তীমশাই! এমন কোনো খবর এখনও কাগজে বেরোয়নি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, এটা আপনার একেবারে টাটকা অভিজ্ঞতা। এবার ব্যাপারটা খুলে বলুন। শোনা যাক।

এইসময় ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। চক্রবর্তীমশাই মাথা থেকে মাফলার খুলে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, কর্নেলসায়েব ঠিকই ধরেছেন। আমার মেয়ে তপতীর বিয়ে দিয়েছি হাজিগঞ্জে। আমার জামাই অশোক ওখানে নামকরা ডাক্তার। নার্সিংহোম খুলেছে। এদিকে তপতীও ডাক্তার। ওরা দুজনে নার্সিংহোম চালায়।

সাপেকাটা লোক দুটোকে কি সেই নার্সিংহোমে আনা হয়েছিল?

হ্যাঁ। তবে প্রথমে নিয়ে গিয়েছিল সরকারি হাসপাতালে। সেখানকার ডাক্তার বলেছিলেন, তাঁর কিছু করার নেই। তখন অশোকের নার্সিংহোমে এনেছিল। অশোকের কাছে ডেথ সার্টিফিকেট আদায় করেছিল।

বডির পোস্টমর্টেম হয়েছিল?

না। মফস্বলের ব্যাপার। সাপেকাটা ডেডবডির পোস্টমর্টেম করাতে চায় না। প্রথম দিনের বডিটা কুড়ি-একুশ বছরের একটি ছেলের। ওদের একটা ক্লাব আছে। ক্লাব থেকে গঙ্গার ধারে জঙ্গলে একটা পোড়োবাড়ির কাছে ওরা গিয়েছিল পিকনিক করতে। কিছু ছেলে ওখানে ক্রিকেট খেলছিল। খেলার সময় বলটা পাঁচিলঘেরা পোড়োবাড়ির ভেতর গিয়ে পড়ে। একজন পাঁচিল ডিঙিয়ে বলটা আনতে যায়। তারপর আর তার পাত্তা নেই। ডাকাডাকি করে শেষে ওরা পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকে। তারপর দেখে সেই ছেলেটি আগাছার জঙ্গলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

দ্বিতীয় দিনের ঘটনাটা বলুন!

ভদ্রলোক একজন রিটায়ার্ড স্কুলটিচার। সেই পোড়োবাড়ির একটা অংশ গঙ্গায় ধসে পড়েছে। উনি নাকি প্রায়ই সেখানে গিয়ে বসে থাকতেন। শুনলুম, মাথায় একটু ছিট ছিল। পরদিন বিকেলে জেলেরা নৌকোয় ওখানে মাছ ধরতে গিয়ে ভদ্রলোককে দেখতে পায়। উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। গলার পাশে সূক্ষ্ম দুটো ক্ষতচিহ্ন।

আপনার মেয়ে-জামাই দুজনেই ডাক্তার। তাদের কী মত?

অশোকের মতে, আপাতদৃষ্টে বিষাক্ত সাপের কামড়ে মৃত্যুর সব লক্ষণ প্রকট। তপতীর মতে, পোস্টমর্টেম করলে বোঝা যেত। যাই হোক, ওদের দুজনের মতে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ওই এলাকায় নাকি বিষাক্ত সাপের ডেরা। বিশেষ করে একবার ওখানে একটা শঙ্খচূড় সাপ মারা পড়েছিল কোন শিকারির গুলিতে।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর বললেন, কিন্তু আপনার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে?

চক্রবর্তীমশাই কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, হ্যাঁঃ। শঙ্খচূড় হোক কি গোখরো হোক, ড্রাকুলা—মানে ভ্যাম্পায়ারের মতো গলায় দাঁত বসাবে কেন? বলতে পারেন এটা কোইনসিডেন্স। কিন্তু আমার খটকা থেকে গেছে। হাজিগঞ্জ খুব পুরনো শহর। হিস্টোরিক্যাল প্লেস।

কর্নেল হাসলেন। জানি। তবে নামটা হাজিগঞ্জ নয়, হিউজেসগঞ্জ। লোকের মুখে মুখে হাজিগঞ্জ হয়ে গেছে।

চক্রবর্তীমশাই ভুরু কুঁচকে তাকালেন। বলেন কী! আপনি কখনও গেছেন নাকি ওখানে?

বছর খানেক আগে গিয়েছিলুম। আপনি যে জঙ্গলটার কথা বললেন, ওখানে একসময় রেশমকুঠি ছিল! রবার্ট হিউজেস নামে একজন ইংরেজ সেই রেশমকুঠির পত্তন করেন। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল। আর যে পোড়োবাড়িটার কথা বললেন, ওটার নাম ছিল গঙ্গাভবন। বিক্রম সিংহ নামে একজন রাজপুত বাড়িটা তৈরি করেন। তাঁর বংশধরদের পদবির সঙ্গে পরে 'পাটোয়ারি' শব্দটা জুড়ে যায়। কারণ তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যে নেমে পড়েন। মোহন সিংহ পাটোয়ারির নাম কি আপনি শুনেছেন?

সদাশিব চক্রবর্তী চোখ কপালে তুলে বললেন, ওরে বাবা! আপনি যে আমার জামাইয়েব দেশের হাঁড়ির খবর রাখেন দেখছি। হ্যাঁ। তাই বলছিলুম না? আপনি বহুদর্শী মানুষ! পাটোয়ারিজিকে বিলক্ষণ চিনি। ওঁদের কলকাতাতেও ট্রেডিং এজেন্সি আছে। সত্যি বলতে কি, ওঁর বাবা ধনপত সিংহ পাটোয়ারি ছিলেন আমার মক্কেল। তাঁর কাছেই তো তপতীব জন্য উপযুক্ত ছেলের খোঁজ পেয়েছিলুম। গত মাসে ধনপতজি মারা গেছেন।

চক্রবর্তীমশাই ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। তাবপর চোখ নাচিয়ে বললেন, মোহনজির সঙ্গে আপনার যখন আলাপ আছে, তখন আপনি একবার গিয়ে ওখানে নাক গলান কর্নেলসায়েব! খটকা মোহনজিরও মনে বেধেছে। হাবেভাবে বুঝতে পেরেছি, উনিও ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেননি। আচ্ছা চলি! এখন এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। নয় তো আরও ডিটেলস আলোচনা করা যেত। জয়ন্তবাবু! এই টোপটা গিলে ফেলুন। অন্য কাগজের হাতে পড়ার আগেই আপনি বাজিমাত করে দিন!

চক্রবর্তীমশাইকে গম্ভীর দেখায় বটে। তবে তিনি আমুদে মানুষ। চোখে-মুখে নানা ভঙ্গি করে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। বললুম, আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে কর্নেল!

কর্নেল চোখ খুললেন না। বললেন, শঙ্খচূড় সাপের স্বভাব হলো তাড়া করে ছোবল মারা। লেজে ভর দিয়ে ছড়ির মতো সোজা হতে পারে এরা। কাজেই গলায় দাঁত বসানোতে অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না। তবে—

তবে?

অর্ধেন্দুবাবুর মৃত্যুটা দুঃখজনক। উনিই আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, গঙ্গাভবনে বিষাক্ত সাপেব আড্ডা। অথচ উনি ওখানে দিব্যি ঘুরে বেড়াতেন। দূর থেকে বাইনোকুলারে ওঁকে দেখেছিলুম।

অর্ধেন্দুবাবু কে?

সেই রিটায়ার্ড স্কুলটিচাব। বলে কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। গত শীতে হিউজেসগঞ্জে বেড়াতে গিয়ে মোহন সিংহ পাটোয়ারির সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। গঙ্গার ধারে ওঁর একটা এগ্রিকালচারাল ফার্ম আছে। সেই ফার্মের পশ্চিমে গঙ্গার অববাহিকায় বিশাল একটা জলা। শীতের সময় নানাদেশের জলপাখি এসে সেখানে জোটে। পাখি দেখতে গিয়ে মোহনজির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওঁর অনুরোধে একদিন ফার্মহাউসের বাংলোতে কাটিয়েছিলুম। জযন্ত! সরডিহা যাওযার প্রোগ্রাম বাতিল করে হিউজেসগঞ্জ গেলে মন্দ হয় না।

শঙ্খচূড়রহস্যের সমাধানে?

কর্নেল হাসলেন। নাহ্। নীলসারস দর্শনে। মোহনজির ফার্মে অনেক গাছপালা আছে। হিমালয়বাসী নীলসারস জলা থেকে উড়ে এসে ফার্মের গাছে বসে থাকে। গতবার অনেক চেষ্টা করেও নীলসাবস-দম্পতির ছবি তুলতে পারিনি। এবার গিয়ে—

কর্নেল হঠাৎ চুপ করলেন। বললুম, চলে যান।

কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন, নাহ্। সরডিহার প্রোগ্রাম বাতিল করা ঠিক নয়। কুমারবাহাদুর রাজেন্দ্রপ্রতাপ দুঃখ পাবেন। মনে-মনে চটে যাবেন। ওঁর আমন্ত্রণে রাজী হয়ে যাওয়ার পর আর না করা চলে না। তাছাড়া ওখানে পাহাড়-জঙ্গল-নদীব একটা রোমাঞ্চকর আকর্ষণ আছে। তুমি তা হলে আগামী পরশু ট্যাক্সি করে আমাব এখানে চলে আসবে। গাড়ি এনো না। নিচের গ্যারাজ আর খালি নেই। সময়টা মনে আছে তো? বিকেল তিনটেয এখানে পৌঁছানো চাই। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন অবশ্য সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। তবে হাতে সময় নিয়ে বেরুনো ভাল। হাওড়া ব্রিজে যা জ্যাম হয়!...

সেদিনই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার নিউজরুমে টেবিলে গরম চায়ের কাপ রেখে চুমুক দিচ্ছি এবং পুলিশ সূত্রে পাওয়া একটা ডাকাতি কেসের

খবর লিখছি। তখন রাত প্রায় নটা বাজে। কপিটা শেষ করেই অফিস থেকে কেটে পড়ব। প্রেস ক্লাবে আড্ডা দিতে যাব। এমন সময় কর্নেলের টেলিফোন এল। সাড়া দিয়ে বললুম, বলুন বস্!

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত, তুমি কখন বেরুচ্ছ অফিস থেকে?

মিনিট পনের পরে। কেন বলুন তো?

অফিস থেকে সোজা আমার ডেরায় চলে এস।

কী ব্যাপার?

ফোনে বলা যাবে না। তবে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি। রাখছি।

খবরটা বেশ জমকালো ভাষায় লিখতে শুরু করেছিলুম। সেই সুরটা আর রাখা গেল না। কোনোরকমে শেষ করে চিফ রিপোর্টারের কাছে জমা দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

রাস্তায় জ্যাম ছিল না। এলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়িতে পৌঁছুতে মিনিট কুড়ি লাগল। পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে হন্তদন্ত সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় ওঁর অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টের পেলুম ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছি।

ডোরবেলের সুইচ টিপলে ষষ্ঠীচরণ দরজা খুলে চাপা স্বরে বলল, একটা মেয়েছেলে এসে খুব কান্নাকাটি করছে। বাবামশাই একেবারে নাকাল।

ভেতর থেকে কর্নেলের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, জয়ন্ত! চলে এস।

দরজার পর ছোট্ট ওয়েটিং রুমটা ডাক্তারদের চেম্বারে রোগীদের বসার ঘরের মতো। সামনের পর্দা তুলে জাদুঘরসদৃশ বিশাল ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখি, ভিজে চোখে শোকাকুলা এক যুবতী বসে আছে। গায়ে ছাইরঙা কার্ডিগান। পাশে একটা সাদাসিধে ব্যাগ।

সে আমার দিকে একবার তাকিয়ে কর্নেলের দিকে ঘুরল। কর্নেল বললেন, আলাপ করিয়ে দিই। জয়ন্ত! এর নাম মৈত্রেয়ী। হিউজেসগঞ্জের সেই স্কুলটিচার অর্ধেন্দুবাবুর মেয়ে। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর কথা তুমি সকালে শুনেছ। মৈত্রেয়ী! এই আমার স্নেহভাজন বন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী।

মৈত্রেয়ী আমাকে নমস্কার করল। আমিও নমস্কার করে সোফার একপাশে বসলুম। কর্নেল বললেন, সবডিহার প্রোগ্রাম বাতিল করতে হলো জয়ন্ত!

বললুম, কী ব্যাপার?

অর্ধেন্দুবাবুর মেয়ে হিউজেসগঞ্জ থেকে ছুটে এসেছে। আর তুমি জিজ্ঞেস করছ কী ব্যাপার? বলে কর্নেল চোখ কটমট করে আমার দিকে তাকালেন।

আমতা আমতা করে বললুম, মানে সেই শঙ্খচূড়রহস্য?

কর্নেল হেসে ফেললেন। তা বলতে পারো। যাই হোক, ব্যাপারটা হলো,

গত শীতে হিউজেসগঞ্জে গিয়ে অর্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর অভ্যাসবশে তাঁকে আমার নেমকার্ড দিয়েছিলুম। সেইসঙ্গে বলেছিলুম, কোনো প্রয়োজন হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কেন বলেছিলুম কে জানে? দূর থেকে বাইনোকুলারে ওঁর গতিবিধি দেখে এবং পরে মুখোমুখি আলাপ করে হয়তো আমার মনে হয়েছিল, উনি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই গঙ্গাভবন এলাকায় ঘোরাঘুরি করেন। তো মৃত্যুর দিন সকালে অর্ধেন্দুবাবু ওঁর মেয়ে—এই মৈত্রেয়ীকে আমার নেমকার্ডটা দিয়ে বলেছিলেন, দৈবাৎ কিছু ঘটে গেলে মৈত্রেয়ী যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

মৈত্রেয়ী ভিজে গলায় বলল, তখন বাবার ওই কথাটার মানে নিয়ে কিছু ভাবিনি। আসলে মায়ের মৃত্যুর পর থেকে ক্রমশ বাবা কেমন যেন হয়ে উঠেছিলেন। সবসময় অন্যমনস্ক। ডাকলে চমকে উঠতেন। বিড়বিড় করে আপনমনে কী সব বলতেন। একটা কথা প্রায় বলতেন! বিষদাঁত উপড়ে দেব! তারপব গত বুধবার বিকেলে বাবার ডেডবডি জেলেপাড়ার লোকেরা দেখতে পেল। সবাই বলল, তরুণ সংঘের স্বপনের মতোই মাস্টারমশাইকে সাপে কামড়েছে। এদিকে এই কার্ডটার কথা কাল অব্দি আমার মনে পড়েনি। আজ সকালে মনে পড়ল। তখনই রেল স্টেশনে চলে গেলুম। তারপর—

মৈত্রেয়ী শ্বাস ছেড়ে চুপ করল। কর্নেল বললেন, একটা ভুল হয়েছে। বডির পোস্টমর্টেম করানো উচিত ছিল।

মৈত্রেয়ী আস্তে বলল, আমাদের ওই এলাকায় সাপেকাটা ডেডবডির পোস্টমর্টেম করা হয় না। আমার মাথাতেও তাই এই প্রশ্নটা জাগেনি। তাছাড়া গঙ্গাভবনের ওখানে চন্দ্রনাথকাকু একবার একটা শঙ্খচূড় সাপ মেরেছিলেন বন্দুকে। উনি নামকরা শিকারি। এখন অবশ্য আইনের কড়াকড়িতে শিকার ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর গত তিনদিন উনি বন্দুক নিয়ে শঙ্খচূড়ের জোড়াটাকে খুঁজেছেন।

বললুম, শঙ্খচূড়ের জোড়া মানে?

কর্নেল বললেন, লোকের বিশ্বাস, গঙ্গাভবনের ওখানে এক শঙ্খচূড়দম্পতি ছিল। চন্দ্রনাথবাবু তাদের একজনকে গুলি করে মেরেছিলেন।

মৈত্রেয়ী বলল, আমি চলি কর্নেলসায়েব! রাত হয়ে যাচ্ছে।

কর্নেল বললেন, এখন তুমি কোথায় যাবে?

এন্টালিতে আমাব মাসি থাকেন। সেখানে রাত কাটিয়ে সকালের ট্রেনে বাড়ি ফিরব। বাড়িতে তো কেউ নেই। আজকাল চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেছে। রিস্ক নিয়েই এসেছি। মৈত্রেয়ী কান্না চাপল।

কর্নেল বললেন, তুমি মাসির বাড়ি চিনতে পারবে?

হ্যাঁ। মাসির বাড়িতে থেকেই আমি এম. এ. পড়েছি।

তাই বুঝি? অবশ্য জয়ন্ত ওর গাড়িতে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারে।

মৈত্রেয়ী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জয়ন্তবাবুকে কষ্ট করতে হবে না। আমি চলি। আপনি বাবাব এক্সারসাইজ খাতাটা রেখে দিন। আর—কবে যাচ্ছেন বলুন? আমার বাড়িতেই থাকবেন। কোনো অসুবিধে হবে না।

হবে। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। আমরা ইরিগেশন বাংলো বা অন্য কোথাও থাকব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। তবে একটা কথা। তুমি যে আমার কাছে এসেছিলে বা আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, এসব কথা কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে।

আপনাকে তো বলেছি। আমি গোপনে এসেছি। মাসিমাকেও এসব কথা বলব না।

মৈত্রেয়ী যাবার সময় আমাকে নমস্কার করে গেল। কর্নেল তাকে এগিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর ইজিচেয়ারে বসে বললেন, আমার বরাত জয়ন্ত!

বললুম, মেয়েটিকে মফস্বলের বলে মনেও হয় না। বেশ স্মার্ট। সাহসী।

কী শুনলে? কলকাতায় মাসির বাড়িতে থেকে এম. এ. পাশ করেছে। তবে হ্যাঁ, কান্নাকাটি করলেও মনের জোব আছে। দরকার হলে ওকে কাজে লাগানো যাবে।

কিন্তু কেসটা কী? মানে, আমি বলতে চাইছি, দুটো ঘটনাই কি খুনখারাপি?

আমি কি অন্তর্যামী, ডার্লিং? কর্নেল একটু হেসে বললেন, অর্ধেন্দুবাবুর খাতার পাতা উল্টে কিছু বুঝলুম না। খানিকটা ডায়রি। আবার পদ্য লেখার চেষ্টা। কোথাও হিজিবিজি ছবি। যাই হোক, তবু এটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার ওই এক কথা জয়ন্ত! সত্য জিনিসটা এমন যে অনেক সময় তা ফালতু জিনিসের মধ্যে পড়ে থাকে।

কবে যাচ্ছেন হাজিগঞ্জ—সরি, হিউজেসগঞ্জ?

ওখানে গিয়ে তুমি ভুলেও হিউজেসগঞ্জ বলবে না। কেউ বুঝতে পারবে না। ওটা এখন হাজিগঞ্জ। কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা জ্বেলে বললেন, কাল একটা পাঁচে হাওড়া-সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরব। পৌঁছুতে আট ঘণ্টার বেশি লাগতে পারে। ওই ট্রেনটা কাটোয়ার পর ফাঁকা হয়ে যায়। আরামে যাওয়া যাবে। মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় হয়। থাকার ব্যবস্থাটা ইরিগেশন বাংলোতেই করা ভালো। দেখি, মনীশকে বাড়িতে পাই নাকি।

মনীশ মানে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি মনীশ মিত্র?

আবার কে? বলে কর্নেল টেলিফোন ডায়াল করতে থাকলেন।

আমি হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে অর্ধেন্দুবাবুর খাতাটা তুলে নিলুম। মলাট খুলতেই চোখে পড়ল, সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছেঃ

'এই খাতা খুলে পড়লে তোর বাবার বাবা কর্তাবাবা চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে। ওরে মূর্খ! তুই এর কী বুঝবি? খাতা বুজিয়ে রেখে প্রণাম কর্। নতুবা সর্পাঘাতে তোর মৃত্যু অনিবার্য।'

এর তলায় ফণাতোলা একটা সাপ আঁকা আছে। হাসি পাচ্ছিল। কয়েক পাতার পর দেখি, নদীর বুকে একটা নৌকো আঁকা। তার তলায় দুলাইন পদ্য।

'ফুটো বোট করে ফ্লোট গ্যাঞ্জেস রিভারে
রাজপুত হলো ভূত ম্যালেরিয়া ফিভারে।'

একেবারে শেষ পাতা উল্টে দেখি, আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছেঃ

'বুধবার দুপুরে চরম বোঝাপড়া। বিষদাঁত ভেঙে দেব বাছাধনেব।'

লাইনটা পড়েই কর্নেলের দিকে তাকালুম। কর্নেল ততক্ষণে ফোন রেখে চুপচাপ বসে ছিলেন। আস্তে বললেন, দেখেছি। গত বুধবার কার বিষদাঁত ভাঙতে গিয়ে অর্ধেন্দুবাবু মারা পড়েছেন।...

।। দুই ।।

এমন বিরক্তিকর ট্রেনজার্নির অভিজ্ঞতা ছিল না। তাতে দেড়ঘণ্টা লেট। রাত সাড়ে দশটায় হাজিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছেছিলুম। তবে কর্নেলের ভক্তরা সর্বত্র বিরাজমান। সেচবাংলোর কেয়ারটেকার সাধনবাবু জিপ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কাজেই কোনো অসুবিধে হয়নি।

সেচবাংলো শহর থেকে প্রায় দু কিলোমিটার দূরে। কর্নেল যে বিশাল জলার কথা বলেছিলেন, তার উত্তর প্রান্তে গঙ্গার ধারে একটা উঁচু জায়গায় অবস্থিত। বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে। রাতের খাওয়া শেষ করে কর্নেল দক্ষিণের বারান্দায় বসে চুরুট টানছিলেন। বারান্দায় শীতের হাওয়ার উপদ্রব নেই। কিন্তু শীতের উৎপাত আছে। সাধনবাবু সপরিবারে বাংলোর পেছনদিকের কোয়ার্টারে থাকেন। কর্নেল তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি ঘরের ভেতর থেকে বেরোইনি। ওঁদের কথাবার্তা কানে আসছিল। তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা।

সাধনবাবু বলছিলেন, গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যানে স্লুইস গেটের দিকটা পাথর ফেলে মজবুত করা হয়েছে। নৈলে গঙ্গা যেভাবে মাটি খাচ্ছিল, এই বাংলো

আস্ত থাকত না। অথচ দেখুন, পাটোয়ারিজিদের ফার্মের দিকটা নিরাপদ। কারণ ওঁদের পূর্বপুরুষের তৈরি গঙ্গাভবন গঙ্গার ভাঙন রুখে দিয়েছে। রেশমকুঠির জঙ্গলও ভাঙনরোধেব কাজ করছে।

কর্নেল বললেন, ট্রেনে আসবার সময় হাজিগঞ্জের কিছু লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। তারা বলল, গঙ্গাভবনের ওখানে নাকি শঙ্খচূড় সাপের কামড়ে দুজন লোক মারা গেছে।

হ্যাঁ। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। আপনি তো পাখির পেছনে ছোটাছুটি করে বেড়ান। ওই এরিয়ায় যেন যাবেন না।

এই শীতে সাপেব উপদ্রব হওয়ার তো কথা নয় সাধনবাবু!

আমিও তো তাই জানতুম। কিন্তু অনেকে বলছে, শঙ্খচূড় নাকি শীতে কাবু হয় না। এদিকে আরেক কাণ্ড!

বলুন!

জনসাধারণের চাপে পড়ে পাটোয়াবিজি গত পরশু কোথা থেকে দুজন বেদে ডেকে এনেছিলেন। তারা মন্ত্রতন্ত্র পড়ে সাপটাকে খুব খোঁজাখুঁজি করেছিল। তারপর বলেছিল, গত কালই সাপটাকে তারা ধরে ফেলবে। পাটোয়ারিজি তাদের ফার্মহাউসে বেখেছিলেন। আজ সকালে নাকি দুজনকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বলেন কী!

সাধনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আসলে ভোরের বাসে তারা কেটে পড়েছে। যে বাসে তারা পালিয়েছে, তার কন্ডাক্টার বাদলের মুখে শুনলুম। বাদল তাদের চিনতে পেরেছিল। বাদলকে তারা বলেছে, পাহাড়ি মুলুক থেকে তাদের ওস্তাদকে আনতে যাচ্ছে। কারণ এমন সাংঘাতিক সাপ ধরা তাদের সাধ্য নয়। বাদল বলেছিল, হাবভাব দেখে তার ধারণা, ওরা খুব ভয় পেয়ে পালাচ্ছে!

আচ্ছা সাধনবাবু! আপনি তো এখানে অনেকদিন আছেন?

চাব বছর হয়ে গেল সার!

গতবার আপনি বলেছিলেন গঙ্গাভবনেব দোতলায় মাঝে মাঝে ভুতুড়ে আলো দেখা যায়।

সাধনবাবু চাপা গলায় বললেন, আলো এখনও দেখা যায়। এই তো কিছুদিন আগে এখান থেকে দেখতে পেয়েছিলুম। খুব বেশি দূরে তো নয় নাকবরাবর বড়জোর হাফ কিলোমিটার দূরত্ব। টাউন এরিয়া আরও হাফ কিলোমিটার দক্ষিণে। মধ্যিখানে কুঠিবাড়ির জঙ্গল। কাজেই আমার চোখের ভুল নয়। ত ছাড়া আলোটা এক জায়গায় স্থির ছিল না। কে যেন লণ্ঠন হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

নাহ্। এবার শুয়ে পড়া যাক। শীতটাও বেড়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ। লম্বা ট্রেনজার্নি করেছেন। শুয়ে পড়ুন সার! বলে বারান্দায় জুতোর শব্দ করতে করতে সাধনবাবু চলে গেলেন।

কর্নেল ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বললেন, জয়ন্ত, জেগে আছ দেখছি।

আপনাদের কথা শুনছিলুম।

কী বুঝলে?

রাজপুতদের পোড়োবাড়িটা ভূতের ডেরা। সদাশিববাবু ড্রাকুলা এবং ভ্যাম্পায়ারের কথা বলছিলেন। সম্ভবত ওখানে ওইরকম কোনো হিংস্র প্রেতাত্মা আছে।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, যা বলেছ! বেদেরা হয়তো তাই কেটে পড়েছে। কিংবা সত্যিই পাহাড়ি মুলুকে তাদের ওস্তাদকে ডেকে আনতে গেছে। বেদেরা অবশ্য ভূতের মন্ত্র জানে কি না জানি না।...

ঘুম ভেঙেছিল সকাল আটটায়। চৌকিদার বেড-টি দিয়ে গিয়েছিল। কর্নেল যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। কিছুক্ষণ পরে কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ ফুটল। তখন বারান্দায় গিয়ে দেখলুম, দক্ষিণে নিচের দিকে একটা জলা। জলজ উদ্ভিদ গজিয়ে আছে কিনারায়। বাংলোর সামনের অংশটা তত চওড়া নয়। কিন্তু পশ্চিমে ক্রমশ চওড়া হতে হতে দিগন্তে কুয়াশার মধ্যে মিশে গেছে। সমুদ্রের মতো বিশাল দেখাচ্ছে। বাঁদিকে পূর্বে স্লুইস গেট। তার ওধারে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণে কিছুটা দূরে কাঁটাতারের বেড়া এবং একটা সুদৃশ্য বাংলো দেখা যাচ্ছিল গাছপালার ভেতর। ওটাই তাহলে পাটোয়ারিজির ফার্ম।

কর্নেল ফিরলেন সাড়ে নটা নাগাদ। জিজ্ঞেস করলুম, হানাবাড়ির দিকে গিয়েছিলেন নাকি?

কর্নেল ওভারকোট এবং টুপি খুলে বললেন, গিয়েছিলুম উল্টোদিকে। গঙ্গার বাঁকের মাথায় একটা পুরনো শিবমন্দির আছে। সেখানে এক সাধুবাবার আবির্ভাব হয়েছে। এই শীতে খালি গায়ে ছাই মেখে ধুনির সামনে বসে ধ্যানস্থ। কথা বলার জন্য চেষ্টা করলুম। ধ্যান ভাঙল না। ফেরার সময় একটা জেলে-নৌকো দেখে তাদের ডাকলুম। অবশ্য তারা কিনারার কাছাকাছি ছিল। তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে কথায়-কথায় জানা গেল, গত রাত থেকে তারা মাছ ধরে বেড়াচ্ছে। শেষ রাতে তাদের বস্তিতে ফেরার কথা। কিন্তু গঙ্গাভবনের পেছন দিকে ভুতুড়ে আলো দেখে তারা আর সাহস করে এগোতে পারেনি। ছোট্ট নৌকো নিয়ে মাঝগঙ্গায় যাওয়ার ঝুঁকি আছে। বস্তিতে ফিরতে হলে কিনারা ঘেঁষেই যেতে হবে। তাই সকালের রোদ ফোটার প্রতীক্ষায় আছে তারা।

বললুম, বড্ড ভিতু তো! আসলে কুসংস্কার---

কর্নেল আমার কথার ওপব বললেন, কুসংস্কার বলো আর যাই বলো, এলাকার লোকেরা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে বোঝা গেল। নিছক শঙ্খচূড় সাপের ভয় নয়। প্রেতাত্মার ভয়। সেই প্রেতাত্মাই নাকি সাপের রূপ ধরে দুটো মানুষেব প্রাণ নিয়েছে।...

ব্রেকফাস্টের পর কর্নেল আমাকে নিয়ে বেরোলেন। স্লুইস গেটের ব্রিজে পৌঁছে বললুম, গতবাত্রে আমরা কোন পথে এসেছিলুম?

কর্নেল বললেন, এই পথে। তুমি জিপের পেছনে ছিলে বলে বুঝতে পারোনি। ওই দেখ, বাঁদিকে সেই হানাবাড়ি দেখা যাচ্ছে। তারপর রেশমকুঠির ধ্বংসাবশেষের ওপর গজিয়ে ওঠা জঙ্গলটাও দেখতে পাচ্ছ। সেচদফতর এই পিচ রাস্তাটা তৈরি করেছে। আমরা কুঠির জঙ্গলের ভেতর দিয়েই যাব। জঙ্গলটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেব হাতে গেছে। তারা আরও গাছ লাগিয়ে একটা দুর্ভেদ্য জঙ্গল গড়ে ফেলেছে।

কিছুটা এগিয়ে সাধনবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি সাইকেলে চেপে আসছিলেন। ক্যাবিয়ারে প্রকাণ্ড থলে ভর্তি শীতেব সবজি উঁকি দিচ্ছিল। আমাদের দেখে সাইকেল থামিযে বললেন, গিযেছিলুম জিপে। আসছি সাইকেলে। ইঞ্জিনিয়াব সাযেব ফবাক্কা যাবেন। তাই জিপ ফেরত দিয়ে এলুম। সাইকেলটা জিপে চাপিযে নিযে গিয়েছিলুম। তা আপনারা বেড়াতে বেরিযেছেন?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। গতবছর নীলসারস দেখেছিলুম। এবার তারা এসেছে নাকি দেখা যাক।

সাধনবাবু হাত নেড়ে বললেন, উঁহু হুঁ! পাখি দেখতে ভুলেও যেন জঙ্গলে ঢুকবেন না সার! এই যে আমি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাইকেলে এলুম, প্রাণ হাতে কবে এসোছ। শঙ্খচূড় সাপ নাকি মাটিতে পায়ের শব্দ শুনেই তাড়া করে আসে। কদিন থেকে এই এলাকায় লোকজন দেখা যাচ্ছে না।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, আমি বাইনোকুলাবে দূর থেকে পাখি দেখব। জঙ্গলে ঢোকার কী দবকার?

সাধনবাবু সাইকেলে চেপে চলে গেলেন। কর্নেল ডানদিকে কিছুটা দূরে পাটোয়রিজির ফার্ম হাউসটা বাইনোকুলারে দেখে নিলেন। তাবপর পা বাড়িয়ে বললেন, চলো! ফার্মহাউসে মোহন সিংহ আছেন নাকি দেখি।

কিছুদূর চলার পর এই পিচ বাস্তা থেকে সংকীর্ণ একটা মোরাম বিছানো রাস্তা বেরিয়ে ফার্মহাউসের দিকে এগিয়ে গেছে। আমরা সেই রাস্তা ধরে ফার্মহাউসের গেটে গেলুম। একজন তাগড়াই চেহারার লোক এগিয়ে এসে সেলাম দিযে বলল, কর্নেলসাব কখন আসলেন?

গত রাত্রে।

সে গেট খুলে বলল, আসেন! অন্দরে আসেন কর্নেলসাব!

মোহনজি আছেন কি?

উনহি তো আজ ফজিরে কলকাত্তা চলিয়ে গেলেন। দো দিন বাদ আসবেন।

ঠিক আছে রাজু! আমি কয়েকটা দিন আছি। মোহনজি ফিরলে বলবে, আমি ইরিগেশন বাংলোয় উঠেছি।

রাজু নামে লোকটি হঠাৎ আস্তে বলল, কর্নেলসাব! থোড়া হোশিয়ারিসে যাবেন। জঙ্গলে ঘুষবেন না।

শুনেছি। বিষাক্ত সাপের কামড়ে দুজন নাকি মারা গেছে।

রাজু ফিসফিস করে বলল, উয়ো সাঁপ না আছে কর্নেলসাব! উয়ো মোহনজির চাচা মহেন্দরজির পেরেতাত্মা আছে। মহেন্দরজি দশ-বারা সাল আগে গঙ্গায় নাহান করার সময়ে ভেসে গেছ্‌লেন। উনহির লাস পাওয়া যায়নি।

কে বলল তোমাকে?

হাম শুনা। লেকিন কর্নেলসাব, ইয়ে বাত আপনি আমার কাছে শুনেছেন বলবেন না। আমার নোকরি চলিয়ে যাবে। আমি আপনা আঁখসে দেখেছি সাব! রাতমে পেরেতাত্মা আলো জ্বালে।

কর্নেল তাকে আশ্বস্ত করে পা বাড়ালেন। জঙ্গলের রাস্তায় পৌঁছে বললুম, কত সব অদ্ভুত কথা জানা যাচ্ছে!

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। আলোটা তাহলে মোহনজির কাকা মহেন্দ্রজির প্রেতাত্মাই জ্বালেন এবং সম্ভবত কিছু খুঁজে বেড়ান।

গুপ্তধন নয় তো?

কর্নেল তাঁর প্রসিদ্ধ অট্টহাসি হাসলেন। তারপর বাইনোকুলারে হানাবাড়িটা দেখে নিয়ে হাঁটতে থাকলেন।

প্রায় এক কিলোমিটার হাঁটার পর বাঁদিকে টালির চালের ছোট ছোট বাড়ি দেখা গেল। শীতের রোদে জাল শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বুঝলুম, এটা জেলেবস্তি।

জেলেবস্তির পর শহরের চেহারা ভেসে উঠল। এদিকটা বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। কর্নেল বললেন, এটা নতুন টাউনশিপ। পুরনো হিউজেসগঞ্জ যেতে সাইকেল রিকশ চাপতে হবে।

একটা সাইকেল রিকশ ডেকে কর্নেল বললেন, আরোগ্য নার্সিংহোমে চলো।

এবার মফস্বল শহরের ঘিঞ্জি রাস্তা, ভিড়ভাট্টা দেখতে পেলুম। অনেক ঘুরে গঙ্গার তীরে ঈষৎ পরিচ্ছন্ন এবং নিরিবিলি এলাকায় দোতলা নার্সিংহোমে পৌঁছলুম।

কর্নেল বললেন, আজকাল সব মফস্বল শহরে অজস্র নার্সিংহোম দেখা

যাবে। কলকাতার নার্সিংহোমগুলোব চেয়ে এগুলোর চাকচিক্য বেশি। ওই দেখ! রিসেপশনে সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। কেমন হাসিখুশি আর স্মার্ট। লক্ষ্য করো!

বললুম, এটা তাহলে চক্রবর্তীমশাইয়ের মেয়ে-জামাইয়ের নার্সিংহোম!

তা আর বলতে?

রিসেপশনেব তরুণীর কাছে কর্নেল এগিয়ে যেতেই সে হাসিমুখে বলল, বলুন সার!

তপতী—মানে ডক্টর তপতী ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তপতীদি তো এখন ব্যস্ত। কী ব্যাপার বলুন?

কর্নেল নেমকার্ড বের করে তাকে দিয়ে বললেন, এটা ওর কাছে পাঠিয়ে দিলে খুশি হব।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি কার্ডটা দেখে একজনকে বলল, এই কার্ডটা দিদিকে দিয়ে বলে এসো ইনি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনাবা বসুন সাব!

মিনিট পাঁচেক পরে ফর্সা ছিপছিপে চেহারার সুশ্রী এক যুবতী, গায়ে সাদা ডাক্তাবি কোট এবং গলায় স্টেথিস্কোপ, হন্তদন্ত এসে কর্নেলকে বললেন, কী আশ্চর্য! কর্নেলকাকু এখানে?

বলেই ঢিপ করে কর্নেলের পায়ে একটি প্রণাম। কর্নেল বললেন, আমি জানতুম না তুমি এখানে এসে জাঁকিয়ে বসেছ। তোমার বাবার কাছে সব শুনেছি। আলাপ করিয়ে দিই। জয়ন্ত চৌধুরী।

সৌজন্যপ্রকাশের পর তপতী আমাদের দোতলায় তার চেম্বারে নিয়ে গেলেন। বললেন, বাবা সম্প্রতি এসেছিলেন। এখানে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে। বাবা বলছিলেন, ফিবে গিয়ে আপনাকে বলবেন। তপতী একটু হাসলেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন, আপনি নিশ্চয় রহস্যেব পেছনে ছুটে এসেছেন?

কর্নেল জোরে মাথা নেড়ে বললেন, না। আমাব এখানে আসবার প্রোগ্রাম আগে থেকে ঠিক করা ছিল। গত শীতেও তো এসেছিলুম। তখন জানতুম না তুমি এখানে আছ!

এক মিনিট। কফি বলি!

থাক তপতী! ইরিগেশন বাংলোয উঠেছি। সেখানে প্রচুর কফি খেয়ে বেরিয়েছি। তোমাব সঙ্গীটি কোথায়?

অশোক ও টিতে ঢুকেছে। একটা সিরিয়াস অপারেশন আছে।

তা হলে তো অসময়ে এসে পড়েছি!

না, না। পরে অশোকের সঙ্গে আলাপ হবে। কাল দুপুরে আপনি আমাদের বাড়িতে খাবেন। আপনাকে দুজনে গিয়ে নিয়ে আসব।

আমরা কালকের দিনটা নৌকো করে ঘুরতে বেরুব। নেমন্তন্ন পরে এসে

খাব। তো তুমি রহস্য কথাটা বললে। তোমার বাবাও প্রায় একই কথা বলেছেন। কেন রহস্য বলছ?

তপতী একটু চুপ করে থেকে বললেন, অশোকের মতে, দুটো বডিতেই আপাতদৃষ্টে বিষাক্ত সাপের কামড়ের লক্ষণ ছিল। কিন্তু আমি কথাটা মেনে নিতে পারিনি।

কেন?

কমন সেন্স। শঙ্খচূড় হোক, কিংবা অন্য কোনো বিষাক্ত সাপ হোক, একবার কাউকে কামড়ানোর পর তার বিষদাঁত গজাতে এবং বিষ জমতে সময় লাগে। কাজেই ধরে নিতে হয়, দুটো সাপ দুজনকে কামড়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, এখন সাপের হাইবারনেশন পিরিয়ড।

হ্যাঁ। তোমার পয়েন্টটা নির্ভুল। তবে কোইনসিডেন্স—

তপতী কর্নেলের কথার ওপর বললেন, না কর্নেলকাকু! একটা পয়েন্ট নিয়ে পরে অশোকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দুটো বডিতেই ছড়ে যাওয়ার দাগ ছিল। স্বপন নামে যে ছেলেটির বডি এনেছিল, তার হাঁটুতে একটু দাগ দেখেছি। সোয়েটারের গলার কাছটা একটু ছেঁড়া ছিল। আর অর্ধেন্দুবাবুর হাঁটুতেও একই দাগ। তাঁর চিবুকে একটু ক্ষত ছিল। যেন পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। স্বপনও। এদিকে অর্ধেন্দুবাবুর ডান হাতের তালুতে সাদা পাওডারের মতো একটু চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলুম। লোকের কুসংস্কার। সাপেকাটা বডি পোস্টমর্টেম করতে দেবে না। পুলিশকে জানালে অবশ্য বাধ্য হয়ে পোস্টমর্টেম হতো। কিন্তু অশোক বলল, পুলিশের হাঙ্গামায় জড়ানো ঠিক হবে না।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, তাহলে সত্যিই ঘটনাটা রহস্যময়।

হ্যাঁ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুটোই হোমিসাইডাল কেস!

বলো কী!

তপতী আস্তে বললেন, আপনি গোপনে তদন্ত করে দেখুন না! দুটো ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় কোনো লিঙ্ক আছে।

অর্ধেন্দুবাবুর একটি মেয়ে আছে শুনেছি।

হ্যাঁ। মৈত্রেয়ী। ডানপিটে মেয়ে। লেখাপড়ায় অবশ্য ভাল। এম. এ. পাশ করেছে বাংলা নিয়ে। আমি সঠিক জানি না। তাকে কেন্দ্র করেও কিছু—

তপতী চুপ করলে কর্নেল বললেন, কী বলতে চাও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে খুনখারাপি হলে সাপে কামড়ানোর মোডুস অপারেন্ডি কেন? খুনী এমন জটিল প্রক্রিয়া হাতে নেবে কেন?

তা অবশ্য ঠিক। তবে—

বলো!

তপতী আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা কর্নেলকাকু, এমন কি হতে পারে না যে, দুজনেব গলাতে সাপের দাঁতের চিহ্ন দুটো নেহাত মিসগাইড কবার কৌশল? দুজনকে অন্য কোনোভাবে মারা হয়েছে?

তুমি তো ডাক্তার। তুমিই বলো, আর কী ভাবে মারা যায়, যাতে বাইরে থেকে বোঝা যাবে না মার্ডার উইপন কী ছিল?

তপতী একটু হেসে বললেন, পুলিশের লোকেরা এটা ভাল জানে। কমাস আগে পুলিশ হাজতে একটা মৃত্যুর কেস এসেছিল আমাদের হাতে। পোস্টমর্টেম করে তারপর দেখা গেল হার্ট আর লাংয়ে জমাট রক্ত। পিঠের ওপর কম্বল ভাঁজ করে রেখে ভোঁতা কিছু দিয়ে মারা হয়েছে। এখনও মামলা চলছে। অবশ্য এ দুটো কেসে কী হয়েছে বলা কঠিন। পোস্টমর্টেমের সুযোগ পাইনি। কর্নেলকাকু, আপনি অর্ধেন্দুবাবুব মেয়ের সঙ্গে কথা বলুন।

কর্নেল বললেন, দেখা যাক। এবার উঠি। পরে অশোক বাবাজিব সঙ্গে কথা বলব।...

।। তিন ।।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বললুম, তপতীর ধারণা, ব্যাপারটা প্রণয়ঘটিত। তার মানে, মৈত্রেয়ীর কোনো প্রেমিকের মাথায় খুন চড়েছিল। এই তো?

কর্নেল আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

বললুম, তপতীর পয়েন্টটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধরুন, তার প্রেমিক যদি হয় কোনো ডাক্তার?

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালেন।

উৎসাহে বললুম, খুনী যদি ডাক্তার হয়, সে বিষ ইঞ্জেকশন করে মানুষ মারতে পারে। পারে নাকি?

হুঁ।

স্বপন নামে ছেলেটি ক্রিকেট বল কুড়োতে গিয়ে মৈত্রেয়ী আর তার প্রেমিককে পোড়োবাড়িতে আপত্তিজনক অবস্থায় —মানে একটা সম্ভাবনার কথা বলছি!

কর্নেল একটু হেসে একটা সাইকেল রিকশ ডাকলেন। তারপর রিকশতে চেপে বললেন, ইরিগেশন বাংলো।

অমনি রিকশওয়ালা তড়াক করে সিট থেকে নেমে বলল, না সার। ওদিকে যেতে পারব না।

কেন হে? যা ভাড়া চাও, পাবে।

না সার। আপনি একশো টাকা দিলেও ওই রাস্তায় যাব না।

কেন? খুলে বলো তো!

কুঠির জঙ্গলের ওদিকে একটা খ্যাপা শঙ্খচূড় সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ দেখলেই তাড়া করছে।

কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণ আগে আমরা তো ওই রাস্তায় এলুম!

রিকশওয়ালা গোঁ ধরে বলল, আপনাদের বরাত ভাল সার! আমি ওদিকে যাব না। শুধু আমি কেন, কোনো রিকশই ওই রাস্তায় যাবে না। আপনি চেষ্টা করে দেখুন।

ঠিক আছে। জেলেপাড়ার মোড় অব্দি চলো!

হ্যাঁ। ওই পর্যন্ত যাব। বলে সে আবার সিটে চাপল। প্যাডেলে পায়ের চাপ দিয়ে সে ফের বলল, কথায় বলে, 'বাঘের দেখা আর সাপের লেখা।' বাঘ দেখা হলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর কপালে লেখা থাকলে তবেই সাপে দংশায়। আপনাদের কপালে লেখা নেই। তাই বেঁচেছেন। তবে সাবধানে যাবেন সার!

জেলে বস্তির মোড়ে পৌঁছুতে আবার প্রায় আধঘণ্টা লাগল। রিকশওয়ালাকে কর্নেল দশটা টাকা দিতেই সে কপালে হাত ঠেকিয়ে পড়ি-কি-মরি করে রিকশ নিয়ে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, অবস্থাটা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলুম।

সাধনবাবু তাহলে সাহসী মানুষ।

চাকরির দায় মানুষকে সাহসী হতে বাধ্য করে। বলে কর্নেল পা বাড়ালেন।

এখন সামনে থেকে শীতের হাওয়া এসে ধাক্কা দিচ্ছে। জঙ্গলের গাছপালায় অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। হলুদ পাতা ঝরে পড়ছে রাস্তার ওপর। দুধারে জঙ্গলের ভেতরও হলুদ শুকনো পাতার স্তূপ। আসবার সময় এ সব লক্ষ্য করিনি। মনে হলো, সত্যি কোথাও যেন হাজার হাজার শঙ্খচূড় সাপ রাগে ফুঁসছে। গর্জন করছে। কেন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল আমার।

কর্নেল কিন্তু নির্বিকার। মাঝে মাঝে বাইনোকুলারে পাখি খুঁজছেন। থমকে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছেন।

না বলে পারলুম না, আচ্ছা কর্নেল! তখন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু এখন ফেরার সময় কেমন একটা আনক্যানি ফিলিং হচ্ছে।

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে ঘুরে চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, ভয় পেলে জোরে চেঁচিয়ে গান গাইতে হয়। তুমি গান গাও।

হেসে ফেললুম। নাহ্! ভয় পাব কেন? জাস্ট একটা অদ্ভুত ফিলিং! মানে—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিলেন। ওসব কথা থাক। এস। জঙ্গলে ঢোকা যাক।

এদিকে কোথায় যাবেন?

চুপচাপ এস। সাবধানে পা ফেলবে। শুকনো পাতায় যতটা সম্ভব কম শব্দ যেন হয়। বলে কর্নেল কীভাবে হাঁটতে হবে দেখিয়ে দিলেন। চাপা স্বরে ফের বললেন, সাপের ভয় কোরো না। শীতকালে সাপেরা সত্যিই নির্জীব হয়ে পড়ে।

সাপের গর্তে যদি পা পড়ে?

কর্নেল হাসলেন। তোমার জুতো আর জিনসে দাঁত বসানোর ক্ষমতা এখন সাপের নেই।

মনে অস্বস্তি নিয়ে কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। কর্নেল যেখানে পা ফেলে এগোচ্ছেন, আমিও সেখানে পা ফেলছি। প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর গাছপালার ফাঁকে গঙ্গা দেখা গেল।

গঙ্গার ধারে সমান্তরাল একটা পাথরের বাঁধ দেখে বুঝলুম, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের কীর্তি। সেই বাঁধের পথে আরও মিনিট দশেক হাঁটার পর সেই হানাবাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ির পেছন দিকটা গঙ্গায় তলিয়ে গেছে। প্রকাণ্ড সব লাইমকংক্রিটের চাবড়া মাথা উঁচু করে আছে। এদিকের পাঁচিলের অনেকটা অংশ ভেঙে পড়েছে। কর্নেল সেদিকে পা বাড়ালে বললুম, কী সর্বনাশ!

চুপচাপ এস।

বাড়িটার উঠোনে ঘন আগাছার জঙ্গল। মধ্যিখানে ভাঙা একটা ফোয়ারা। ফোয়ারার কাছে গিয়ে কর্নেল ডাইনে ঘুরে দোতলা বাড়িটার দিকে তাকালেন। দরজা-জানলাগুলো নেই। কোনো-কোনো ছাদের বিম বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে বাড়িটা ধসে পড়তে পারে বলে মনে হচ্ছিল।

কর্নেল আস্তে বললেন, এই তাহলে আলো জ্বালানো ভূতের ডেরা?

বললুম, শঙ্খচূড় সাপেরও ডেরা। কারণ এক শিকারি ভদ্রলোক নাকি এখানে একটা শঙ্খচূড় সাপকে গুলি করে মেরেছিলেন।

কর্নেল সামনে একটা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। ওঁকে অনুসরণের সাহস হলো না।

ঘরটার দরজা-জানালা নেই। কারা উপড়ে নিয়ে গেছে। তাই অস্পষ্টভাবে ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল সেই ঘরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলুম।

দীর্ঘ পাঁচ মিনিট কেটে গেল। কর্নেলের পাত্তা নেই। আতঙ্কে অস্থির হয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

কোনো সাড়া এল না।

কী করব ভাবছি, এমন সময় অন্য একটা ঘর থেকে কর্নেল বেরিয়ে এলেন এবং তাঁর পেছনে মৈত্রেয়ী!

কর্নেলকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বললুম, সর্বনাশ! মৈত্রেয়ী এখানে কী করছিলেন?

মৈত্রেয়ী বলল, সাপটাকে খুঁজছিলুম।

কর্নেল বললেন, আমার স্পষ্ট কথা মৈত্রেয়ী! যদি তোমার বাবার মৃত্যুরহস্যের সমাধান তুমি নিজেই করতে চাও, আমার কোনো সাহায্য পাবে না।

মৈত্রেয়ী দুহাতে মুখ ঢেকে বলল, আমি তো বললুম আপনাকে। আমার মাথার ঠিক ছিল না। আপনি এসে পড়ার আগেই খুঁজে দেখতে চেয়েছিলুম—

কর্নেল রুষ্টমুখে বললেন, কথা শোনো! তুমি সাহসী মেয়ে। কিন্তু সর্বত্র সাহস দিয়ে কিছু করা যায় না। তুমি আর কখনও এখানে আসবে না।

মৈত্রেয়ী চোখ মুছে বলল, তাই হবে।

চলো! তোমাকে রাস্তায় পৌঁছে দিই।

দক্ষিণের ভাঙা পাঁচিলের ওপর দিয়ে আমরা হানাবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলুম। তারপর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে সেই রাস্তায় পৌঁছলুম।

কর্নেল বললেন, ভাগ্যিস বাইনোকুলারে দূর থেকে তোমাকে দোতলায় দেখতে পেয়েছিলুম! তুমি জানো না কী বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে তুমি ছিলে!

মৈত্রেয়ী তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টে তাকাল।

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, আমি গিয়ে না পড়লে তোমার অবস্থা তোমার বাবার মতো হতো।

আমি বলে উঠলুম, সে কী!

মৈত্রেয়ী বলল, কিন্তু আমি তো কাকেও দেখতে পাইনি?

বিষধর সাপ থাকে গর্তে লুকিয়ে। কর্নেল চুরুটটা ফেলে দিয়ে জুতোয় ঘষে নিভিয়ে ফেললেন। ফের বললেন, জয়ন্ত! তুমি বাংলোয় ফিরে যাও। মৈত্রেয়ীকে এখানে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আমি ওকে জেলে বস্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। চলো মৈত্রেয়ী!

দুজনে উল্টোদিকে চলে গেলে আমি একা হাঁটতে থাকলুম। স্লুইস গেটের কাছে পৌঁছে হঠাৎ মনে হলো, মৈত্রেয়ী অভিনয় করছে না তো? কর্নেলকে বোকা বানানো অবশ্য সহজ নয়। তাহলেও কিছু বলা যায় না। মৈত্রেয়ী হয়তো তার প্রেমিকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে এসেছিল। কর্নেল গিয়ে পড়ায় প্রেমিকটি গা-ঢাকা দিয়েছে এবং কর্নেল সম্ভবত ভেবেছেন, মৈত্রেয়ী তার দ্বারা আক্রান্ত হতো!

হ্যাঁ—কর্নেল নিশ্চয় তার পালিয়ে যাওয়া টের পেয়েছিলেন!

সেচবাংলোয় পৌঁছুতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। সাধনবাবু এসে বললেন, কর্নেলসায়েবকে কোথায় ফেলে এলেন?

উনি পাখির পেছনে ছুটেছেন!

কাজটা ঠিক করেননি। তো আপনি স্নান করতে হলে করে নিন। গরম জলের ব্যবস্থা আছে বাথরুমে।

বাথরুমে ঢুকে স্নান করার পর ক্লান্তি ঘুচে গেল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বারান্দার রোদে বসলুম। তারপর দেখলাম, এতক্ষণে কর্নেল ফিরে আসছেন।

বাংলোর গেট খুলে লনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উনি বাইনোকুলারে দিগন্তবিস্তৃত জলার দিকটা দেখে নিলেন। তারপর বারান্দায় উঠে বললেন, বাহ্! তুমি স্নান করেছ দেখছি।

আপনি স্নান করে নিন।

আজ নয়। বলে কর্নেল পাশের চেয়ারে বসলেন।

বললুম, মৈত্রেয়ীর ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য!

মেয়েটি বেপরোয়া এবং জেদী। কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, গঙ্গাভবনের নিচেই একটা নৌকো বাঁধা ছিল। আপাতদৃষ্টে জেলে-নৌকো। ছইয়ের ভেতর একটা লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল।

তাকে সন্দেহ করার কারণ কী?

লোকটা যে-ই হোক, জেলে নয়। কারণ তার মাথার একটু অংশ বেরিয়ে ছিল।

সাধনবাবুকে আসতে দেখে কর্নেল চুপ করলেন। সাধনবাবু বললেন, আপনি পাখির পেছনে ছুটেছেন শুনে অস্বস্তি হচ্ছিল।

কর্নেল হাসলেন। আমি সর্পবশীকরণ মন্ত্র জানি সাধনবাবু!

সাধনবাবুও হেসে উঠলেন। আপনি কী যে জানেন না! ইঞ্জিনিয়ার সায়েব বলছিলেন, কর্নেলসায়েব এসে পড়েছেন যখন, তখন শঙ্খচূড় এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাবে! তো লাঞ্চ কখন খাবেন?

আর মিনিট পনের পরে।

সাধনবাবু চলে গেলে বললুম, লোকটার মাথা দেখে বুঝলেন জেলে নয়? মাথা দেখে বোঝা যায়?

যায়। তবে তার চেয়ে বড় কথা মৈত্রেয়ীকে একটা ঘরে দেখে তাকে চার্জ করলুম। অমনি জানলার ফোঁকর দিয়ে দেখলুম, নৌকোটা ভাঁটার টানে ঘুরপাক খেতে খেতে দক্ষিণে ভেসে গেল। তার মানে, আমার সাড়া পেয়েই লোকটা কাছি খুলে ফেলেছিল।

বুঝলুম। কিন্তু মাথা দেখে--

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে উঠে গেলেন। ঘরে ঢুকে পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হলেন।...

খাওয়ার পর অভ্যাসমতো ভাতঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। কম্বলের তলায় ঘুমে তলিয়ে যেতে দেরি হয়নি। চৌকিদারের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। সে চা এনেছিল।

জিজ্ঞেস করলুম, কর্নেলসায়েব কখন বেরিয়েছেন?

চৌকিদার বলল, এখন চারটে বাজে। সার বেরিয়েছেন দুটোর সময়।

কোনদিকে যাচ্ছেন দেখেছ?

টাউনের দিকে গেছেন মনে হলো।

বাবান্দায় শেষ বেলাব লাল বোদ বাঁকা হয়ে পড়েছে। বেতের চেয়ারে বসে চা শেষ করাব পর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হলো। সিগাবেট ছাড়বার চেষ্টা করছি বলে নিজের পয়সায কিনি না।

চৌকিদার লনে মালীর সঙ্গে গল্প করছিল। তাকে ডেকে বললুম, সাধনবাবু কি আছেন?

সে বলল, হ্যাঁ সার।

সাধনবাবু সিগাবেট খান না?

খুব খান সার।

তাহলে ওঁর কাছ থেকে আমার জন্য একটা সিগারেট এনে দাও।

চৌকিদাব চলে গেল পেছনদিকে। একটু পরে সাধনবাবু হাসিমুখে হন্তদন্ত এসে বললেন, আমি সার সিগারেট প্রচণ্ড খাই। কিছুতেই ছাডতে পারলুম না। তো ভেবে দেখলুম, ক্যান্সার যদি হয়, তাহলে বাজে সিগাবেট কেন, দামী সিগারেট খেয়েই হোক। এই নিন পুরো প্যাকেট।

অবাক হয়ে দেখলুম, দামী বিদেশি সিগারেট। বললুম, এ সিগারেট এখানে পাওয়া যায়?

সাধনবাবু বললেন, হাজিগঞ্জে বিদেশি সব জিনিস পাওয়া যায়। সাবান, পারফিউম থেকে শুরু কবে টিভি। স্মাগলিং সার! এখানে স্মাগলারদের বড় একটা ঘাঁটি আছে। আপনি পুরো প্যাকেটটা রাখুন।

আমেরিকায থাকাব সময় কিংসাইজ মার্লবরো আমার প্রিয় ব্র্যান্ড ছিল। সেই সিগারেটের লোভ সম্বরণ করা গেল না। অনেকদিন পর সিগারেট টানতে টানতে মন চাঙ্গা হয়ে উঠল।

বাংলোয টেলিফোন আছে ভুলে গিযেছিলুম। চৌকিদার এসে বলল, আপিস ঘরে আসুন সাব! আপনার টেলিফোন এসেছে।

বাংলোব পেছনদিকে অফিসঘব। টেলিফোন তুলে সাড়া দিতেই কর্নেলের

কণ্ঠস্বর ভেসে এল। জয়ন্ত! আমার ফিরতে সাতটা বেজে যাবে। তোমাব চিন্তার কারণ নেই।

আপনি কি হেঁটে আসবেন?

মোটেও না। চক্রবর্তীমশাইয়ের মেয়ে-জামাইয়ের দু-দুটো গাড়ি আছে। অবশ্য অশোক আমাকে পৌঁছে দেবে। কারণ ওদের একজনকে নার্সিংহোমে থাকতে হবে। তুমি যদি নিঃসঙ্গ বোধ করো, সাধনবাবুর সঙ্গে গল্প করতে পারো। ভদ্রলোক চমৎকার সব গল্প বলেন।

সাধনবাবু আমাকে চমৎকার একটা জিনিস উপহার দিয়েছেন।

কী জিনিস?

কিংসাইজ মার্লবরো সিগারেট। পুরো এক প্যাকেট।

বলো কী!

আপনি হাজিগঞ্জে সবরকম বিদেশি জিনিস পাবেন। খাঁটি হাভানা চুরুটও।

বাহ্। এ তো সুখবর! কিন্তু পাব কোন দোকানে?

অশোকবাবুকে জিজ্ঞেস করুন। উনি খোঁজ না দিতে পাবলে ফিরে এসে সাধনবাবুকে বলবেন। ঠিক পেয়ে যাবেন।

অসাধারণ সুসংবাদ ডার্লিং! রাখছি।...

আমাদের ঘরে ফিবে গিযে দেখি, সাধনবাবু বারান্দায় বসে সিগারেট টানছেন। আমাকে দেখে বললেন, কর্নেলসাযেবের ফোন?

হ্যাঁ। ওঁকে আপনার দেওয়া সিগারেটের কথা বললুম। উনি বললেন, তাহলে সাধনবাবুকে বলে রাখো, আমার এক বাকসো খাঁটি হাভানা চুরুট চাই।

সাধনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, খুঁজে দেখব'খন। গত শীতে কর্নেলসায়েব যখন এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, তখন ভেবেছিলুম ওঁকে এক বাকসো বিদেশি চুরুট প্রেজেন্ট করব। কিন্তু তখন পুলিশ আর কাস্টমসের লোকেরা খুব ধরপাকড় চালাচ্ছিল। সুযোগ পাইনি। এখন স্মাগলাররা তাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে।

কর্নেলের কাছে শুনেছি, আপনি নাকি চমৎকার সব গল্প জানেন?

জানি। তবে সব গল্পই ভূতের। আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?

কখনও ভূত দেখিনি। আপনি দেখেছেন?

অনেক। আসলে এই নিরিবিলি জায়গায় থাকি। ওদিকে একটা পুরনো শিবমন্দির আছে। আবাব এদিকে ওই গঙ্গাভবন। রাতবিরেতে ভূতপ্রেত দেখেছি।

একটা গল্প বলুন।

গল্প নয়। সত্যি ঘটনা।

এই সময় চৌকিদার এসে বলল, বাবু! আপনাব টেলিফোন এসেছে।

হ্যাত্তেরি! কার ফোন?

ইঞ্জিনিয়াব ব্যানার্জি সায়েবের।

সাধনবাবু বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরে বাংলোর আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় দেখলুম, সাধনবাবু সাইকেল নিয়ে বেরুচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় চললেন হঠাৎ?

সাধনবাবু মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, আর বলবেন না। ইঞ্জিনিযার সায়েব ডেকেছেন। উনি টায়ার্ড। কাজেই আমাকেই যেতে হবে। ওদিকে সর্বনাশা সাপের ভয়। এই চাকরি আব আমার সইবে না।...

।। চার ।।

বারান্দায় ঠাণ্ডা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। তাই ঘরে ঢুকে গরম চাদর মুড়ি দিয়ে একটা ইংরেজি থ্রিলাব পড়ে সময় কাটাচ্ছিলুম। চৌকিদার উঁকি মেরে বলল, চায়ের ইচ্ছে হলে বলবেন সার!

তোমার নামটা ভুলে গেছি!

আজ্ঞে শ্রীধর।

হ্যাঁ, শ্রীধর। তুমি কি হাজিগঞ্জের লোক?

না সার! আমার বাড়ি ফরাক্কাব ওদিকে।

এখানে তুমি একা থাকো?

আজ্ঞে।

আমাদের জন্য রান্না কি তুমিই করছ?

না সার! সাধনবাবুর ওয়াইফ কবছেন। বাংলোব রাঁধুনী কান্তঠাকুর ছুটি নিয়েছে।

সাধনবাবুব ছেলেমেযে আছে তো?

শ্রীধর একটু হেসে বলল, আজ্ঞে না। থাকলে তো ভালই হতো। বাবু একটু সমঝে চলতেন।

তার মানে?

ছোটমুখে বড় কথা বলতে নেই সার! দিদিঠাকরুন মাটির মানুষ। তাই সহ্য করে থাকেন। শ্রীধর চাপাস্বরে বলল, বাবু রাতদুপুরে মাতাল হয়ে বড্ড ঝামেলা করেন। আমাকে আর মালী হরকে গিয়ে সামলাতে হয়। তবে বাংলোয় গেস্ট বা অফিসার থাকলে বাবু লক্ষ্মীছেলেটি হযে থাকেন। ওপর-ওপর দেখে বুঝতে পাববেন না বাবুকে।

সাধনবাবু কিন্তু খুব সাহসী লোক।

হ্যাঁ। সে কথা ঠিক। রাতবিরেতে প্রায় আড্ডা দিতে যান হাজিগঞ্জে। মাতাল হয়ে ফিরে আসেন। বলে শ্রীধর নার্ভাস মুখে একটু কাসল। এ সব কথা বাবুর কানে যেন না ওঠে সার! আমি সামান্য লোক।

না, না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

সারকে তাহলে চা এনে দিই?

দাও। তো চা কি সাধনবাবুর স্ত্রী তৈরি করে দেবেন?

না সার। চায়ের সরঞ্জাম, তাছাড়া কফি-টফি এগুলো আপিসঘরের পাশের কিচেনে ব্যবস্থা আছে। হিটার জ্বেলে আমিই চা-ফা করব।

শ্রীধর চলে গেল। মনে হলো, সাধনবাবুর ওপর চাপা রাগ বা ক্ষোভ আছে। মুখ ফসকে আমার কাছে তা জানিয়ে একটু বিব্রত বোধ করছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সে চা আর বিস্কুট নিয়ে এল। তারপর বলল, দরকার হলে ডাকবেন সার। আমি হরদার ঘরে থাকব। ওর কোয়ার্টার কাছেই।

সময় কাটতে চাইছিল না। পৌনে আটটায় বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। বারান্দায় গিয়ে দেখলুম, বাংলোর নিচের রাস্তায় একটা মারুতি এসে থামল। তারপর কর্নেল নেমে এলেন। গেটের আলোয় আবছা ওঁকে দেখা যাচ্ছিল। গাড়িটা ব্যাক করে জোরে চলে গেল।

কর্নেল লনে ঢুকে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল। অশোকের তাড়া আছে। পরে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসবে। তো তুমি একা দেখছি। সাধনবাবুর গল্প শোনা এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল?

বললুম, ইঞ্জিনিয়ার সায়েবের আর্জেন্ট ফোন পেয়ে সাধনবাবু পাঁচটায় সাইকেলে চেপে বেরিয়েছেন। এখনও ফেরেননি। পাঁচটা মানে তখন সন্ধ্যা। ভদ্রলোকের সাহস আছে বটে!

কর্নেল ঘরে ঢুকে মুচকি হেসে বললেন, তা হলে এক বাক্সো বিশুদ্ধ হাভানা চুরুটের আশা করা চলে।

চৌকিদার এসে সেলাম দিল কর্নেলকে। বলল, কফি আনব তো সার?

হ্যাঁ। আজ ঠাণ্ডাটা একটু বেশি মনে হচ্ছে। আবার এক পেয়ালা কফি দরকার।

চৌকিদার চলে গেল। বুঝলুম, সে কর্নেলের অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত।

কর্নেল চেয়ার টেনে বসে টুপি খুললেন। তারপর প্রশস্ত টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, অশোকের চেম্বার থেকে তোমাকে ফোন করেছিলুম। তারপর অশোক আমাকে নিয়ে গিয়েছিল হিউজেসগঞ্জের পুরনো জমিদার-বংশধর চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর কাছে। শঙ্খচূড়ের হালহদিস শুনলুম।

বললুম, ভদ্রলোক কি সত্যিই গঙ্গাভবনে একটা শঙ্খচূড় মেরেছিলেন?

উনি স্বীকার করলেন, সর্পবিশারদ নন। তবে সাপটা ছিল প্রায় সাত ফুট লম্বা। প্রকাণ্ড ফণা। লেজে ভর করে ফুঁসছিল। ওঁর হাতে ছিল দোনলা বন্দুক। পাখিমারা ছররা গুলি ভরা ছিল। পর-পর দুটো গুলিতেও সাপটা কাবু হয়নি। শেষে কয়েকটা ইঁট ছুঁড়ে তাকে টিট করেন। গঙ্গাভবন এবং কুঠির জঙ্গলে নাকি এর আগেও উনি কয়েকটা বিষাক্ত সাপ মেরেছেন। তবে এই সাপটা দেখে ওঁর মনে হয়েছিল, হামাড্রায়াড অর্থাৎ শঙ্খচূড়।

ওঁকে জিজ্ঞেস করেননি একই সাপ দুজনকে কামড়াতে পারে কি না?

কর্নেল হাসলেন। দুজনকে কেন, এক ডজন লোককে কামড়াতে পারে। তপতীর প্রশ্নটা হলো, কামড়ালে বিষদাঁত ভেঙে যায়। আবার বিষ জমতে দেরি হয়। চন্দ্রনাথবাবুর মতে, দুজনকে দুটো সাপে কামড়েছে।

এই শীতকালেও?

চন্দ্রনাথবাবুর বক্তব্য হলো, বিষাক্ত সাপের ওপর পা দিলে বা দৈবাৎ আছাড় খেয়ে পড়লে কামড়াবেই।

অশোকবাবুর কী ধারণা? উনি তো ডাক্তার।

চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে উনি একমত। গলায় কামড় নিছক কোইনসিডেন্স।

কিন্তু আপনি আজ নৌকোয় বিষাক্ত সাপের মতো একজন মানুষকে দেখেছেন! আপনার বক্তব্য, আপনি হঠাৎ গিয়ে না পড়লে মৈত্রেয়ী মারা পড়ত তার হাতে।

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমি কি বলেছি সে মৈত্রেয়ীর গলায় সাপের মতো দাঁত বিঁধিয়ে দিত?

হেসে ফেললুম। না। তা বলেননি বটে!

চৌকিদার কফি নিয়ে এল ট্রেতে। বলল, সাধনবাবু এখনও ফিরলেন না। আপনারা ডিনার কখন খাবেন সার?

অসুবিধে না হলে সাড়ে নটায়।

চৌকিদার চলে গেল। কর্নেল বললেন, আর ওসব কথা নয়। বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যাবে, যত বেশি মাথা ঘামাবে। কফি খাও। নার্ভ চাঙ্গা হবে।

বলেই কর্নেলের দৃষ্টি গেল মার্লবরো সিগারেটের প্যাকেটের দিকে। ওটা টেবিলে রেখেছিলুম। কর্নেল প্যাকেটটা দেখে রেখে দিলেন।

বললুম, সাধনবাবু আপনাকে নিরাশ করবেন না।

কর্নেল বললেন, বাহ্! সাধনবাবু তোমাকে একটা দেশলাইও দিয়েছেন। তবে দিশি জিনিস।

চৌকিদার বলছিল, সাধনবাবু প্রচণ্ড মাতাল হয়ে বউয়ের সঙ্গে ঝামেলা বাধান।

জানি। গত শীতে এসে শ্রীধরের কাছে কথাটা আমিও শুনেছিলুম। তবে ওসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়ে লাভ নেই।

কর্নেলকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। চুপচাপ কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজে টানতে থাকলেন। আমি একটা মার্লবরো সিগারেট ধরিয়ে সেই বইটা পড়ার চেষ্টা করছিলুম। একটু পরে বাংলোর গেটের দিকে গাড়ির আলো এবং হর্ন শোনা গেল।

দরজা খোলা ছিল এবং গেটটা আমার চেয়ার থেকে দেখা যায়। দেখলুম, শ্রীধর দৌড়ে গিয়ে গেট খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকল। একটা জিপগাড়ি এসে পোর্টিকোর তলায় দাঁড়াল। তারপর ওভারকোট এবং হনুমানটুপি পরা এক বেঁটে ভদ্রলোক জিপ থেকে বেরিয়ে বারান্দায় উঠলেন। মাথার টুপি খুলে ঘরে ঢুকে সম্ভাষণ করলেন, কর্নেল সরকার! আশা করি কোনো অসুবিধে হচ্ছে না?

কর্নেলের দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে ছিলেন। কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বললেন, বসুন মিঃ ব্যানার্জি! আমার মনে হচ্ছিল, জরুরি কাজে আটকে গেছেন বলে দর্শন পাচ্ছি না।

ভদ্রলোক একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, ঠিক তা ই। আজ ফরাক্কায় গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের ব্যাপারে জরুরি মিটিং ছিল। কাল প্রায় দুপুররাত্রি অব্দি কাগজপত্র তৈরি করতে হিমশিম খেয়েছি। হচ্ছে ছিল ট্রেনেই যাব। কিন্তু বিস্কু নিইনি। সাধনকে ফোনে জিপটা নিয়ে যেতে বললুম। আশা করি, আপনি এজন্য কিছু মনে করেননি?

কর্নেল হাসলেন। না, না। আপনি তো জানেন, গাড়ির চেয়ে আমি পায়ে হাঁটতেই ভালবাসি। কারণ গাড়ি নিয়ে সর্বত্র যাওয়া যায় না। আলাপ করিয়ে দিই। জয়ন্ত চৌধুরী। আমার স্নেহভাজন বন্ধু। সাংবাদিক। আর জয়ন্ত! ইনি এখানকার ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এস ডি ব্যানার্জি।

নমস্কার বিনিময়ের পর মিঃ ব্যানার্জি বললেন, কিছুক্ষণ আগে ফরাক্কা থেকে ফিরেছি। কাল আবার আর এক জায়গায় ছুটতে হবে। বনমালীপুরে একটা ওয়াটারড্যামের প্ল্যান করা হয়েছে।

বলে তিনি ডাকলেন, শ্রীধর!

বাইরে থেকে চৌকিদার সাড়া দিল, স্যার!

সাধনকে ডেকে আনো।

শ্রীধর অবাক হয়ে বলল, বাবু তো সন্ধ্যের মুখে আপনার টেলিফোন পেয়ে সাইকেলে চলে গেছেন। এখনও ফেরেননি

আমার টেলিফোন পেয়ে? আমি তো ওকে ফোন করিনি।

বাবু তো তাই বলে গেলেন স্যার!

মিঃ ব্যানার্জি একটু হেসে বললেন, সাধনটা মহা আড্ডাবাজ হয়ে উঠেছে। অন্য কেউ ডেকেছে। ওর কোনো বন্ধুই হবে। ওকে একটু ধাতানি দিতে হবে। পই পই করে বলেছিলুম, বাংলোয় বিশিষ্ট গেস্ট আসছেন। সারাক্ষণ নাগালের মধ্যে থাকবে। যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

কর্নেল বললেন, না, না, মিঃ ব্যানার্জি। কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। শ্রীধরই যথেষ্ট।

শ্রীধর বলল, চা-কফি কিছু খাবেন সার?

মিঃ ব্যানার্জি বললেন, নাহ্। এখনই চলে যাব। বলে তিনি কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। আপনি যা খেয়ালি মানুষ। হঠাৎ কখন হুট করে কেটে পড়বেন। তাই একবার চোখের দেখা দেখে গেলুম। কোনো বিশেষ প্রয়োজন থাকলে সাধনকে বলবেন। একটু-আধটু বদ অভ্যাস থাকলেও লোকটি খুব কাজের। শ্রীধর! এঁদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

শ্রীধর বলল, আমি সবসময় আছি সার!

কর্নেল বললেন, আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি! গঙ্গাভবন আর কুঠির জঙ্গল এলাকায় এত রাত্রে যাতায়াত করতে আপনার অস্বস্তি হচ্ছে না?

ব্যানার্জিসায়েব হাসলেন। ও! সেই সাপের ব্যাপার! ছাড়ুন তো! যত সব সুপারস্টিশন! তবে সাপের গায়ে পা পড়লে সাপ তো কামড়াবে। তা সে শীতে হোক আর যখন হোক।

কিন্তু গলায় কামড়াবে?

পা হড়কে সাপের গর্তের কাছে মাথা পড়লে সাপ যদি নাগাল পায়, গলাতেও ছোবল দেবে।

দুদিনে দুটো লোকের গলাতেই সাপের ছোবল?

দেখুন কর্নেল সরকার! ওই এরিয়াটা দুশো বছরের পুরনো ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপে ঢাকা ছিল। পরে জঙ্গল গজিয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও প্রচুর গাছ লাগিয়েছে। কিন্তু মাটির তলায় বহু ফাটল বা গর্ত আছে। ওখানে বিষাক্ত সাপ প্রায় দেখা যায়। বলে ব্যানার্জি সায়েব উঠে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ— আপনার আবার পাখি প্রজাপতির পেছনে ছোটাছুটি করার অভ্যাস আছে। একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। তবে আমি বলি কী, সোজা এই ন্যাচারাল ওয়াটারড্যামের ধারে ধারে চার কিলোমিটার পশ্চিমে রেলব্রিজ আর হাইওয়ে ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় যদি যান, সেখানে প্রচুর হিমালয়ান ডাক দেখতে পাবেন। আজ সকালে যাওয়ার সময় দেখেছি। এমন কি অজস্র ক্রেনও গাছে-গাছে বসে আছে লক্ষ্য করেছি।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বাহ্। এ একটা সুসংবাদ।

ব্যানার্জিসায়েব আমার দিকে বাও করে মাথায় হনুমানটুপিটি পরে নিয়ে বেরুলেন। কর্নেল তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পোর্টিকোর কাছে গেলেন।

শ্রীধর এই ফাঁকে চাপা গলায় আমাকে বলল, তাহলে সাধনবাবুর কাণ্ড দেখুন সার!

কথাটা বলেই সে বেরিয়ে গেল। ব্যানার্জি সায়েবের গাড়ির পাশ দিয়ে দৌড়ে সে গেটটা আবার খুলে দিল।...

রাত সাড়ে নটায় আমরা ডাইনিং রুমে খেতে গেলুম। সেই সময় কোনো মহিলার চেঁচামেচি শুনতে পেলুম। শ্রীধরকে বললুম, কে চেঁচামেচি করছে?

শ্রীধর বলল, দিদিঠাকরুন সার!

তাহলে সাধনবাবু ফিরেছেন?

আজ্ঞে না। দিদিঠাকরুনের ওই অভ্যেস! রাগ হলে আপনমনে বাবুকে গালাগালি করেন। মাথা ক্রমে ক্রমে গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই ফিট হন। ফিটের ব্যারামও আছে।

কর্নেল বললেন, সাধনবাবুর স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করো জয়ন্ত! ভদ্রমহিলা চমৎকার রাঁধেন। বাংলোর বাঁধুনীর রান্না নেহাত দায়সারা!

বললুম, সাধনবাবু এত রাত অব্দি আড্ডা দিয়ে একা ফিরবেন? সত্যি! ওঁর সাহসের প্রশংসা করা উচিত।

শ্রীধর একটু ইতস্তত করে বলল, তখন ফোন করেছিল একজন মেয়েছেলে। সে বলল, ইঞ্জিনিয়ার সায়েব সাধনবাবুকে ডেকেছেন। জরুরি কাজ আছে। ওঁকে ডেকে দাও। এদিকে সায়েব বলে গেলেন, তিনি ডাকেননি। সাধনবাবুর কিছু বোঝা যায় না।

সাধনবাবুর আড্ডাটা কোথায় জানো শ্রীধর?

একটা আড্ডা জমিদারবাড়িতে।

চন্দ্রনাথবাবুর কাছে?

আজ্ঞে। আর একটা আড্ডা ঘাটবাজারে কালীকেষ্টবাবুর গদিতে।

কর্নেল আমার দিকে চোখ কটমটিয়ে বললেন, খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই।

অতএব চুপ করে গেলুম।...

সকালে শ্রীধরের ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। সে বেড-টি টেবিলে রেখে চলে যাচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলুম, সাধনবাবু ফিরেছেন?

শ্রীধর গম্ভীর মুখে বলল, আজ্ঞে না। বোধ করি নেশার ঘোরে রাত্তিরে ফিরতে পারেননি। একেবারে বাজার করে ফিরবেন।

সাধনবাবু তা হলে কোনো-কোনো রাতে বাড়ি ফেরেন না?

আজ্ঞে। তবে বাংলোয় গেস্ট বা অফিসার থাকলে এমন করেন না। কে জানে কী ব্যাপার!

শ্রীধর চলে গেল। কর্নেল ঘরে নেই। যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। কিন্তু আজও বাইরে ঘন কুয়াশা। নিচের জলার ওপর কুয়াশার গাঢ় ধূসর পর্দা টাঙানো আছে।

কর্নেল ফিরলেন নটা নাগাদ। ঘরে ঢুকে বললেন, এখনই ব্রেকফাস্ট করে বেরুব। তৈবি হয়ে নাও।

বললুম, সাধনবাবু এখনও বাড়ি ফেরেননি জানেন?

কর্নেল কথাটা কানে নিলেন না। বেরিযে গিয়ে শ্রীধরকে ডেকে এখনই ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে বললেন। তারপর ওভারকোট খুলে পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হলেন। ছাইরঙা জ্যাকেট গায়ে চড়ালেন।

গতরাত্রি থেকে কর্নেলকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। এখন তো আরও গম্ভীর এবং যেন কিছুটা অন্যমনস্ক। অথচ উনি কৌতুকপ্রিয় মানুষ। জটিল রহস্যের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতেও ওঁকে রসিকতা করতে দেখেছি।

ব্রেকফাস্ট করে আমবা বেবোলুম। বাইরে তখনও কুয়াশা পুরোটা কাটেনি। নিচের রাস্তায় গিয়ে কর্নেল আস্তে বললেন, আবার একটা মানুষ মরেছে জয়ন্ত! গলার কাছে একই রকমের দুটো সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন।

চমকে উঠে বললুম, কোথায় মরেছে? কখন?

হইচই হবে বলে শ্রীধরকে বলিনি। মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে প্রথমে গিয়েছিলুম শিবমন্দিরের সেই সাধুদর্শনে। তাঁকে আজ দেখতে পাইনি। তারপর হাঁটতে হাঁটতে স্লুইস গেট পেরিয়ে গঙ্গাভবনের দিকে যাচ্ছিলুম। তখন কুয়াশা খুব ঘন ছিল। গঙ্গাভবনের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে শুকনো পাতার ওপর একটা টর্চ পড়ে আছে। ওটা চোখে পড়ত না। কিন্তু টর্চটার বাল্‌ব মিটমিট কবে জ্বলছে। তারপর একটু তফাতে একটা সাইকেল পড়ে থাকতে দেখে—

কর্নেলের কথার ওপর বলে উঠলুম, সাইকেল?

হ্যাঁ। সাইকেলটার উল্টোদিকে নিবু-নিবু টর্চ। আর পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটা মানুষ। গায়ে সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট। মাথায় জড়ানো মাফলার খানিকটা খুলে গেছে। পরনে প্যান্ট, মোজা এবং জুতো। বুটজুতো বলে খুলে পড়েনি। কর্নেল ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন। খানিকটা বাষ্প বেরিয়ে গেল।

ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম। বললুম, মানুষটা কি সাধনবাবু?

হ্যাঁঃ।

সর্বনাশ! তারপর?

সম্ভবত শেষ রাতের ঘটনা। হন্তদন্ত হাঁটতে হাঁটতে থানায় খবর দিলুম। পুলিশ এসে বডি তুলে নিয়ে গেছে। ঘটনাটা আমি চেপে রাখতে অনুরোধ করেছি পুলিশকে। পোস্টমর্টেমের পর সাধনবাবুর স্ত্রীকে খবর দেওয়া হবে।

হতবাক হয়ে কর্নেলকে অনুসরণ করলুম।...

।। পাঁচ ।।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে কর্নেল বললেন, একটা ব্যাপার স্পষ্ট। সাইকেলে চেপে আসার সময় সাধনবাবু এখানেই তাঁর আততায়ীকে সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য টের পেয়ে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। এখানে সাইকেল থেকে নেমে পড়েন। ওখানে তাঁর টর্চ পড়ে ছিল। লক্ষ্য করো, তিনি পাটোয়ারিজির ফার্মহাউসের দিকে ছুটে পালাতে চেয়েছিলেন। কারণ আর কয়েক পা এগোলেই ফার্মহাউসে যাওয়ার রাস্তা। কিন্তু আততায়ী তাঁকে ধরে ফেলে। হাতের টর্চ ধস্তাধস্তিতে ছিটকে পড়ে। তারপর তাঁর গলায় শঙ্খচূড়ের বিষাক্ত দাঁত বিঁধে যায়।

বললুম, শঙ্খচূড়ের দাঁত মানে?

এখনও বুঝতে পারছ না? অন্য কেউ সাধনবাবুর ডেডবডি এখানে ওই অবস্থায় দেখলে স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই ধরে নিত, শঙ্খচূড় সাপ তাঁকে তাড়া করেছিল। তাঁর সাইকেলের চাকায় সম্ভবত সাপটা জড়িয়ে গিয়েও থাকতে পারে। তাই তিনি সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে নামেন। বাকিটা কল্পনা করে নিতে লোকের অসুবিধে হতো না।

বলে কর্নেল এবার গতি বাড়ালেন. অনেক প্রশ্ন আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কোনো মেয়ে সাধনবাবুকে কাল সন্ধ্যায় ফোন করে বলেছিল, ইঞ্জিনিয়ারসায়েব ডেকেছেন। তারপর সাধনবাবুর তো ইঞ্জিনিয়ারসায়েবের কাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে তিনি যাননি। অন্য কোথাও গিয়েছিলেন এবং সেখানে শেষ রাত অব্দি ছিলেন। কী করছিলেন সেখানে? তাছাড়া শেষ রাতেই বা ফিরে আসছিলেন কেন?

শ্রীধরের বক্তব্য অনুসারে ধরে নেওয়া যায়, তিনি মদের আড্ডায় জমে গিয়েছিলেন। শেষ রাতে নেশা কেটে যায় এবং যেহেতু বাংলোয় গেস্ট আছে, তাই ফিরে আসছিলেন।

হ্যাঁ। এটাই সম্ভবত ঘটেছিল। কিন্তু কেউ তাঁকে হত্যার জন্য এই প্রচণ্ড

ঠাণ্ডা রাতে এখানে অপেক্ষা করবে কেন, যদি না সে জানে কখন তিনি বাড়ি ফিরবেন?

নাহ্। যত ভাবব, মাথার ভেতরটা জট পাকিয়ে যাবে। সঙ্গে বৃদ্ধ রহস্যভেদী আছেন। তিনিই এসব নিয়ে ভাবুন।

জেলেবস্তির মোড়ে পৌঁছে একটা সাইকেল রিকশ পাওয়া গেল। কর্নেল রিকশতে উঠে বললেন, থানায় চলো!

হিউজেসগঞ্জের পশ্চিম অংশে থানা কোর্টকাছারি হাসপাতাল। থানায় পৌঁছুতে প্রায় কুড়ি মিনিট লাগল। ততক্ষণে কুয়াশা মুছে রোদ ফুটেছে।

অফিসার-ইন-চার্জ উঠে দাঁড়িয়ে কর্নেলকে সম্মান জানালেন। তাঁর ঘরে দুজন অফিসার বসে ছিলেন। তাঁরা বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। অফিসার-ইন-চার্জ বয়সে যুবক বললেই চলে। নাম রমেন্দ্র মণ্ডল। তিনি বললেন, আগে কফি খান কর্নেল সায়েব। তারপর কথা হচ্ছে। আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

কর্নেল হাসলেন। ক্লান্ত নয়, উত্তেজিত। যাই হোক, কফি আসুক। তবে তার আগেই কথা বলতে অসুবিধে নেই।

রমেন্দ্রবাবু বললেন, তা নেই। কিন্তু শুনলে আপনি হতাশ হবেন। একটু আগে মর্গের ডাক্তার খবর দিলেন, রক্তে বিষ পেয়েছেন। হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে। নেহাত স্নেকবাইটিং কেস। অবশ্য এটা প্রাইমারি ফাইন্ডিং। ডিটেল রিপোর্ট তৈরি করে পরে পাঠাবেন।

গলায় কামড়েছে সাপ?

আপনার কথামতো ওই পয়েন্টটা তুলেছিলুম। ডাক্তারের মতে, ভদ্রলোক সম্ভবত সাইকেলের চাকা স্লিপ করে সাপের মুখের কাছেই আছাড় খেয়েছিলেন। সাপটা ওখানে শুকনো পাতার তলায় কোনো ফাটলে ঘুমোচ্ছিল।

বডি যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে কোনো ফাটল দেখিনি!

রমেন্দ্রবাবু হাসলেন। ওখানে চারদিকে শুকনো পাতার স্তূপ জমে আছে। ফাটল আছে কিনা পরীক্ষা করতে হলে সব পাতা সরিয়ে দেখতে হয়। তাই না?

হ্যাঁ। তা ঠিক। কর্নেল সায় দিলেন। গর্ত থাকাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ পুরো এলাকার তলায় অজস্র ধ্বংসাবশেষ আছে। ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্যানার্জি বলছিলেন।

কফি এল। রমেন্দ্র মণ্ডল বললেন, কফি খান। জয়ন্তবাবু! আপনি নিন।

কফি খেতে খেতে রমেন্দ্রবাবু বললেন, সাধনবাবু গত রাতে প্রাক্তন জমিদারবাড়িতে চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দাবা খেলছিলেন। চন্দ্রনাথবাবুকে

আমাদের অফিসাব খুলে বলেননি, কেন একথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। শুধু বলেছেন, সকালে উনি বাড়ি ফেরেননি। তাই ওঁর স্ত্রী থানায় এসেছিলেন। চন্দ্রনাথবাবু বলেছেন, সাধনবাবু এগারোটায় চলে যান। কালীকৃষ্ণবাবুর গদিতে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। অতরাতে গদি খোলা থাকে না। যাই হোক, আমাদের অনেক সোর্স আছে। তাদের বলা হয়েছে। সাধনবাবু—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, একটা কথা। মর্গেব ডাক্তার মৃত্যুর আনুমানিক সময় সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

হ্যাঁ। আপনাব ধাবণা ঠিক! বাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে ভিকটিম মারা গেছেন।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, টর্চের ব্যাটারির অবস্থা দেখে আমি একটা হিসেব করেছিলুম। নিছক অনুমান অবশ্য। ব্যাটারিটা প্রায় নতুন মনে হয়েছিল।

রমেন্দ্র মণ্ডল একটু হেসে বললেন, ও! আসল কথাটা বলাই হয়নি। ভিকটিমের পেটে প্রচুর অ্যালকোহল পাওয়া গেছে। তাব মানে, চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে দাবা খেলে সাধনবাবু কোনো মদের আড্ডায় জুটেছিলেন। এখানে আজকাল মদের আড্ডা প্রচুর। বিদেশি মদও পাওয়া যায়। এখন স্মাগলারদেব অনেকটা শায়েস্তা করা গেছে। ক'বছর আগে তো প্রকাশ্যে রাস্তায় বিদেশি জিনিস বিক্রি হতো।

ড্রাগ—মানে নার্কোটিকস?

হ্যাঁ। তা-ও। এখন কারবাবিরা ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে অন্য এলাকায় গেছে। বলে অফিসার-ইন-চার্জ হেসে উঠলেন। জয়ন্তবাবু তো রিপোর্টার! ফিরে গিয়ে নিশ্চয় কাগজে কিছু লিখবেন! তো সত্যি কথাটা যেন লিখবেন। হাজিগঞ্জ একসময় ছিল নার্কোটিকস আব চোরাই বিদেশি জিনিসের বড় ঘাঁটি। আমি আসার পব সব ঘাঁটি খতম করতে পেবেছি।

বললুম, নিশ্চয় লিখব। তবে পর-পর তিনটি স্নেকবাইটিংয়ের ঘটনাও কিন্তু লিখব।

নিশ্চয় লিখবেন। এই এরিয়ায় স্নেকবাইটিং নতুন ঘটনা নয়। প্রতি বছর এক ডজন করে লোক আমার থানা এরিয়ায় মারা পড়ে। হসপিট্যালের অবস্থা বাজে। সাপের বিষেব ওষুধ নেই। এটাও লিখবেন।

কিন্তু শীতকালেও কি এখানকার লোককে সাপে কামড়ায়?

রমেন্দ্র মণ্ডল গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার ধাবণা ছিল শীতকালে সাপে কামড়ায় না। এখন দেখছি, বিষাক্ত সাপের কাছে শীত-গ্রীষ্ম বলে কিছু নেই। এটা একটু অস্বাভাবিক হলেও মেনে নিতে হচ্ছে। গত সপ্তাহের দুটো ঘটনায় হস্তক্ষেপের সুযোগ পাইনি। কর্নেল-সাযেবের সামনে সাধনবাবুর

ডেডবডি না পড়লে এটাও পুলিশকে জানানো হতো না। এটা বেআইনি ব্যাপার। কিন্তু লোকাল সেন্টিমেন্ট বলে চুপ করে থাকতে হয়।

কর্নেল বললেন, আমি উঠছি। আপনি এবার সাধনবাবুর স্ত্রীকে খবর দিতে পারেন। আর একটা কথা। মর্গের ডাক্তারকে আবার মনে করিয়ে দেবেন, গলায় সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন দুটো সাপের দাঁতের হলে মাইক্রোস্কোপে দাঁত খুঁজে পাওয়া যাবে।

বলে রেখেছি। আবার মনে করিয়ে দেব।...

থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বললুম, সাধনবাবুকে কোনো মেয়ে ফোন করে বলেছিল ইঞ্জিনিয়ারসায়েব ডেকেছেন। ও সিকে কথাটা বলা উচিত ছিল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অপারেটরের কাছে পুলিশ জানতে পারত—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, এখানকার এক্সচেঞ্জ অটোমেটিক। এমন কি এস টি ডি পর্যন্ত আছে। হিউজেসগঞ্জে কোটিপতি ব্যবসায়ীও আছেন। এটা জেলার একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে একটা বড় ব্রিজের ভূমিকা আছে হিউজেসগঞ্জের।

কথাটা শুনে দমে গেলুম। একটু পরে বললুম, তবে ও সি-র ওই কথাটা ঠিক নয়। ফরেন গুডসের স্মাগলিং এখানে বন্ধ হয়নি।

কর্নেল হাসলেন। ও সি-কে ভাগ্যিস তুমি মার্লবরোর প্যাকেট বের করে সিগারেট অফার করোনি!

বললুম, ওই যাঃ! প্যাকেটটা ফেলে এসেছি।

কর্নেল একটা সাইকেল রিকশ ডাকলেন। আমার কথায় কান দিলেন না। রিকশতে চেপে বললেন, তোপপাড়া চলো!

রিকশ চলতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করলুম, তোপপাড়া? সেটা আবার কী?

তোপ চেনো না? কামান। মোগল আমলে ওখানে এক ফৌজদারের তোপখানা ছিল।

সেখানে কার কাছে যাচ্ছি আমরা?

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।

বড় রাস্তা দিয়ে অনেকদূর এগিয়ে বাঁদিকের একটা গলিতে ঢুকে রিকশওয়ালা বলল, এটাই তোপপাড়া সার! কোথায় নামবেন?

তুমি অর্ধেন্দুবাবুকে চেনো? মানে— স্কুলে মাস্টারি করতেন। সাপের কামড়ে মারা গেছেন।

আমি ওনার বাড়ি চিনি না সার!

ঠিক আছে। জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি।

আর একটা গলির মোড়ে গিয়ে কর্নেল রিকশ দাঁড করালেন। একটা বাড়ির বারান্দায় রোদে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কর্নেল তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর বললেন, অর্ধেন্দু তো বেঁচে নেই। তার মেয়ে আছে অবশ্য। আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

কর্নেল বললেন, কলকাতা থেকে। অর্ধেন্দুবাবু আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। তার মৃত্যুর খবর পেয়েই আসছি।

অ। তা ওই যে জলের ট্যাঙ্ক দেখছেন, ওখানে বাঁদিকে ঘুরে কয়েকটা বাড়ির পর জিজ্ঞেস করবেন।

ভদ্রলোকের কথামতো এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরে কর্নেল রিকশওয়ালাকে থামতে বললেন। তারপর ভাড়া মিটিয়ে পা বাড়ালেন। একটা লন্ড্রিতে জিজ্ঞেস করে বাড়িটার খোঁজ পাওয়া গেল। একতলা পুরনো বাড়ি। বারান্দায় উঠে কড়া নাড়তেই মৈত্রেয়ীর সাড়া পাওয়া গেল। দরজা খুলে সে ব্যস্তভাবে বলল, আসুন! ভেতরে আসুন। আমি দুটো মেয়েকে পড়াচ্ছি। ওদের যেতে বলি। আপনারা এ ঘরে বসুন।

ঘরে তিনটে আলমারি ভর্তি বই। কমদামী একটা সোফাসেট। দেয়ালে সম্ভবত অর্ধেন্দুবাবু ও তাঁর স্ত্রীর ছবি। ছবিতে ফুলের মালা পরানো আছে।

দুটি কিশোরী বইখাতা হাতে এ ঘরে এল এবং কর্নেলের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। মৈত্রেয়ী বলল, মাকে বলবে, কলকাতা থেকে আমার আত্মীয় এসেছেন। কেমন?

তাদের প্রায় ঠেলে বের করে দিয়ে সে দরজা বন্ধ করল। তারপর বলল, কী ভাগ্যে এসেছেন! আগে চা-ফা কিছু খান!

নাহ্। কর্নেল বললেন, তুমি বসো। কয়েকটা জরুরি কথা বলে চলে যাব।

মৈত্রেয়ী কর্নেলের মুখোমুখি বসল। তাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

কর্নেল বললেন, একটা প্রশ্ন করছি। আশা করি সঠিক উত্তর দেবে।

কেন দেব না? বলুন?

তুমি কি মাঝেমাঝে চন্দ্রনাথবাবুর বাড়ি যাও?

হ্যাঁ, যাই। উনি সম্পর্কে আমার কাকা হন। বাবার মাসতুতো ভাই।

কর্নেল হাসলেন। তাহলে তুমি এখানকার জমিদারবংশের এক শরিকের মেয়ে!

আমার ওসব ব্যাপারে কোনো স্মৃতি নেই। বাবার অবশ্য একটু গর্বটর্ব ছিল। তো কেন ওকথা জিজ্ঞেস করছেন?

কারণ আছে। বাই এনি চান্স কাল বিকেলে বা ধরো, পাঁচটা নাগাদ তুমি কি কাকার বাড়িতে ছিলে?

ছিলুম।

এগেন বাই এনি চান্স তোমার কাকা কি তোমাকে টেলিফোন করতে বলেছিলেন কাউকে?

মৈত্রেয়ী হাসল। ও! বুঝেছি! ইরিগেশন বাংলোর কেয়ারটেকার সাধনবাবু ভাল দাবা খেলতে পারেন। কাকুরও খুব দাবার নেশা। তো আমাকে বললেন, বাংলোয় গেস্ট আছে। সাধন আসবে না। তুই ওকে ফোন করে বল তো, ইঞ্জিনিয়ারসায়েব ডেকেছেন। আসছে কিনা জেনে নিবি। আমি মোটরবাইকে চেপে ওকে জেলেপাড়ার মোড়ে পিক আপ করব।

তুমি কতক্ষণ ছিলে কাকার বাড়িতে?

ফোন করে শিওর হলুম সাধনবাবু আসছেন। তখন কাকু বেরুলেন। আমাকে বড় রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

কর্নেল নিভে-যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে বললেন, অ্যাশট্রে আছে?

এক মিনিট। দিচ্ছি। বলে মৈত্রেয়ী দেয়ালের তাক থেকে একটা অ্যাশট্রে এনে দিল। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টে তাকাল।

জানা গেছে, সাধনবাবু রাত প্রায় এগারোটা অব্দি তোমার কাকার সঙ্গে দাবা খেলে চলে যান। তারপর উনি অন্য কোথাও ছিলেন। আজ ভোরে ওঁর ডেডবডি পাওয়া গেছে গঙ্গাভবনের সামনে।

মৈত্রেয়ী শিউরে উঠে বলল, মার্ডার?

না। একই কেস। গলার কাছে দুটো সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন। মর্গের ডাক্তারের মতে, বিষাক্ত সাপের কামড়ে মৃত্যু।

মৈত্রেয়ী ফুঁসে উঠল। ডাক্তার ভুল বলেছেন! কেউ বাবার মতো ওঁকেও বিষ ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলেছে। আমি আপনাকে বলেছি, বাবা নিশ্চয় খুনীর কোনো কুকীর্তি দেখে ফেলেছিলেন। যেমন স্বপন বল কুড়োতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাধনবাবুও একই কারণে তার হাতে মারা পড়েছেন।

সাধনবাবু মারা গেছেন রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে। উনি তখন বাড়ি ফিরছিলেন। কারণ রাস্তায় ওঁর সাইকেল আর জ্বলন্ত টর্চ পড়েছিল।

ভারী অদ্ভুত তো! খুনী কি জানত কখন সাধনবাবু বাড়ি ফিরবেন?

কর্নেল আস্তে বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী। একই প্রশ্ন আমারও।

মৈত্রেয়ী একটু চুপ করে থাকার পর বলল, এমন হতে পারে খুনী তাঁকে ফলো করে যাচ্ছিল।

হ্যাঁ। তাহলে সে-ও সাইকেলে যাচ্ছিল ধরে নিতে হয়।

সে তো বটেই।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, এমনও হতে পারে খুনী সাধনবাবুর চেনা লোক। ওঁকে এগিয়ে দেবার ছলে ওঁর সঙ্গ ধরেছিল।

মৈত্রেয়ী মাথা নেড়ে সায় দিল। হ্যাঁ। তা-ও সম্ভব। খুবই সম্ভব। বলে ফের একটু চুপ করে কিছু ভেবে নিল সে। বলল, সাধনবাবুর মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। চন্দ্রনাথকাকুর সঙ্গে ওঁকে মদ খেতে দেখেছি। আমার ধারণা, কাকুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে উনি খুনীর পাল্লায় পড়েন। সে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কোথাও শেষরাত্রি অব্দি মদের আসর বসিয়েছিল। কাকুর কাছে শুনেছি, বিদেশি মদের গন্ধ পেলেই সাধনবাবু মেতে উঠতেন। এখানে ফরেন লিকার পাওয়া যায়। কাকুর মুখে শুনেছি।

কর্নেল চুরুট অ্যাশট্রেতে ঘষে গুঁজে দিলেন। তারপর বললেন, তোমার অনুমান যুক্তিসম্মত। শুধু একটাই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সাধনবাবুকে হঠাৎ এতদিনে মেরে ফেলার দরকার কেন হলো?

মৈত্রেয়ী স্মার্ট মেয়ে। তখনই উত্তর দিল, হয়তো সাধনবাবু তাকে ব্ল্যাকমেল করতেন বা ভবিষ্যতে করবেন ভেবে লোকটা আর রিস্ক নিতে চায়নি।

থাক এসব কথা। তোমার বাড়ি এসে একটা অন্য কৌতূহল জাগছে। বাড়িতে তুমি একা থাকো। ভয় করে না?

নাহ্। ভয় কেন করবে?

হ্যাঁ—তোমার সাহসের পরিচয় পেয়েছি। তোমার ভবিষ্যৎ প্ল্যান কী? এম এ পাশ করেছ। নিশ্চয় চাকরি-টাকরি কিছু করবে?

বাংলায় এম এ। মৈত্রেয়ী হাসল। কে দেবে চাকরি? এখানে একটা মহিলা সমিতি আছে। সেখানে গ্রামের পুরনো সব কুটিরশিল্প নিয়ে কাজকর্ম চলছে। গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেই করে। আমি সমিতিতে যোগ দিয়েছি। অর্গানাইজারের কাজ করছি। একজিবিশান হয়েছে গতবছর। ভবিষ্যতে বিদেশে যাওয়ারও সুযোগ পেতে পারি।

বাহ্। ভাল। বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। আমি চলি। তুমি কিন্তু সাবধানে চলাফেরা কোরো।...

গলিরাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় পৌঁছালুম। কর্নেল বললেন, আজ বাংলোয় লাঞ্চের আশা নেই। এখানকার বিখ্যাত হোটেল জাহ্নবীতে খেয়ে নেব। চলো! একবার চক্রবর্তীমশাইয়ের মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে দেখা

করা যাক। অশোক সাপ সম্পর্কে ভালভাবে আবার পড়াশুনা করতে চেয়েছে। দেখি, কী বলে সে।

এইসময় একটা মারুতি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে উজ্জ্বল ফর্সা রঙের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, হ্যাল্লো কর্নেলসায়েব! কলকাতা থেকে ফিরে শুনলুম আপনি এসেছেন। রাজু বলল। তো ইরিগেশন বাংলোয় গিয়ে শুনলুম, আপনারা বেরিয়ে গেছেন। ওদিকে সাংঘাতিক ঘটনা। বাংলোর কেয়ারটেকারকে নাকি কোথায় সাপে কামড়েছে। মারা গেছেন। উঠে পড়ুন। আপনার খোঁজেই বেরিয়েছি বলতে পারেন। উঠে পড়ুন গাড়িতে।

কর্নেলও বললেন, হ্যাল্লো মোহনজি! তারপর মোহন সিংহ পাটোয়ারির দিকে হাত বাড়ালেন। শেকহ্যান্ডের সময় মোহনজি তাকে টেনে গাড়িতে ঢুকিয়ে পাশে বসালেন।

কর্নেল বললেন, তুমি সামনে বসো জয়ন্ত!

।। ছয় ।।

মোহনজির পরনে ধুতি, সার্জের পাঞ্জাবি আর জহরকোট। চেহারায় রাজপুত ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু তিনি বাংলা বলেন বাঙালির মতোই।

এটা স্বাভাবিক। সাতপুরুষ ধরে তাঁরা হিউজেসগঞ্জের অধিবাসী। এখন পুরোপুরি বাঙালি হিন্দু হয়ে গেছেন। দুর্গাপুজো কালীপুজো করেন বাড়িতে। গাড়িতে যেতে যেতে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে মোহনজি নিজেই আমাকে এসব কথা জানালেন।

গঙ্গাভবনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি বাড়িটা দেখিয়ে বললেন, বাড়িটা তৈরি হয়েছিল রাজস্থানী স্থাপত্যশৈলীতে। কালক্রমে ভেঙেচুরে এমন অবস্থা হয়েছে, সেই শৈলীর চিহ্নমাত্র নেই। তবে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে ঝরোকা আর পদ্মের কিছু চিহ্ন চোখে পড়বে।

তাঁর ফার্মহাউসে পৌঁছে সেই তাগড়াই লোকটিকে দেখতে পেলুম। মোহনজি তাঁকে বললেন, রাজু! তুমি কর্নেলসায়েবের সঙ্গে ইরিগেশন বাংলোয় যাও। ওঁদের ব্যাগেজপত্তর নিয়ে এস। আমি ততক্ষণ জয়ন্তবাবুর সঙ্গে গল্প করি।

ফার্মহাউসের একতলা বাংলোটি দেখে ভাল লাগল। রঙবেরঙের ফুল আর বিদেশি গাছে সাজানো। সেচবাংলোর চেয়ে সুদৃশ্য। বারান্দায় রোদে বসে মোহনজি বললেন, তিরিশ একর জমি নিয়ে এই ফার্ম। বছরে সবরকমের ফসল ফলমূল হয়। সরকারের আইন বাঁচিয়ে ফ্যামিলির পাঁচজনের নামে জমি

কেনা হয়েছিল। মাথাপিছু জমির উর্ধ্বসীমা সরকার বেঁধে দিয়েছেন, তা আপনি নিশ্চয় জানেন। তবে এই ফার্ম আমার নেহাত শখের জিনিস বলতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্য কবতে করতে চুল পেকে গেল। ওসব আর ভাল লাগে না। ছেলেদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে এখানে নেচাবের মধ্যে পড়ে থাকি। স্বস্তি পাই।

বললুম. সাপের উৎপাত যা শুরু হয়েছে, আর স্বস্তি পাবেন বলে মনে হচ্ছে না।

মোহনজি হেসে উঠলেন। তা যা বলেছেন! মজার ব্যাপার দেখুন না! দুজন বেদে এনে শঙ্খচূড় বা বিষধর যে সাপই হোক, ধরতে বলেছিলুম। একশো টাকা বখশিস দিতে চেয়েছিলুম। ওরা মন্তর-তন্তর পড়ে গঙ্গাভবনের ওখানে খুব খোঁজাখুঁজি করল। তারপর রাতটা কাটিয়ে কেটে পড়ল। রাজু বলেছিল, ওদের ওস্তাদকে আনতে গেছে। কিন্তু কোথায় তারা আর তাদের ওস্তাদ? আজ অব্দি তারা ফিবল না। বলে মোহনজি গলার স্বর চাপা করলেন। আমার কিন্তু সন্দেহ জেগেছে। সাপ না অন্যকিছু?

অন্যকিছু বলতে কী?

কোনো হিংস্র উড়ো প্রাণী। ধরুন, ভ্যাম্পায়ার।

এদেশে ভ্যাম্পায়ার আছে বলে জানি না। ব্রাজিলের জঙ্গলে নাকি আছে। তবে সেই ভ্যাম্পায়ারের কামড়ে মানুষ মরে না। তারা খানিকটা রক্ত চুষে খায ঘুমন্ত মানুষের শরীর থেকে। এইমাত্র!

মোহনজি একটু চুপ করে থেকে বললেন, কর্নেলসায়েব একটা কথা বলেন। প্রকৃতির রহস্যের কতটুকু আমরা জানি? ওই কথাটা আমিও বলি। ধরুন, এমন হতে পারে যে, বিষধর সাপের মতো কোনো প্রজাতির ভ্যাম্পায়ার যেভাবে হোক এই তল্লাটে এসে জুটেছে! রক্ত চুষে নেয় দুটো দাঁত দিয়ে। আর দাঁতের বিষে মানুষও মারা পড়ে! বলবেন, এখনও তেমন কোনো প্রাণী এদেশে দেখা যায়নি। হ্যাঁ—এতদিন যায়নি। এখন দেখা যাচ্ছে। কিচ্ছু বলা যায় না। হয়তো শীগগিব উড়ো প্রাণীটি কবে চন্দ্রনাথবাবুর বন্দুকের গুলিতে মাবা পড়বে। তখন হইচই পড়ে যাবে। উনি তো তক্কেতক্কে আছেন—

বলে মোহনজি হাঁক দিলেন, রঘু! রঘু'

একটু তফাতে সারিবদ্ধ একতলা ঘরের বারান্দা থেকে একটা লোক সাড়া দিল, আজ্ঞে?

বাড়িতে দুধ পাঠানো হযেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোহনজি আমার দিকে ঘুরে বললেন, গরুও পুষি। বুঝলেন? দুধের

জন্য গাই-গরু। আর চাষের জন্য বলদ। ওইদিকে টালির চালের লম্বা ঘর দেখছেন। ওটা গোয়ালঘর। আমি মেকানাইজ্‌ড্‌ এগ্রিকালচার পছন্দ করি না। সাবেক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করি। কেমিক্যাল সার একফোঁটা না।

এই সব কথাবার্তা হতে হতে কর্নেল এসে গেলেন। গাড়ি থেকে রাজু আমার এবং কর্নেলের ব্যাগেজ নামিয়ে আনল। মোহনজি বললেন, গতবার কর্নেলসায়েব যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে রেখে এস।

কর্নেল এসে চেয়ার টেনে বসে বললেন, ওদিকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

কী? কী?

বাংলোয় হর মালী একা আছে। পুলিশের গাড়িতে শ্রীধর গেছে সাধনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে। হর বাংলোর সামনের বারান্দায় বসে ছিল। সেই সুযোগে কখন চোর গিয়ে সাধনবাবুর কোয়ার্টারের তালা ভেঙেছে। কী চুরি গেছে হর জানে না। তবে আমি দেখলুম, দুটো ঘর তছনছ করে চোর যেন কিছু খুঁজেছে।

অ্যাঁ? সে কী কথা?

আমি বাংলো থেকে পুলিশকে ফোন করে এলুম।

মোহনজি ভুরু কুঁচকে বললেন, এ চোর হাজিগঞ্জের নয়। বাজি রেখে বলতে পারি। গঙ্গার উজানে একটা গ্রাম আছে দোগাছিয়া। দোগাছিয়াঁ হলো চোরেদের ঘাঁটি।

মোহনজি উঠে দাঁড়ালেন। এত বেলায় আর কফি খাবেন কি? রান্নার ব্যবস্থা কতদূর হলো দেখি। বলে উনি বাংলোর পাশে একটা একতলা ঘরের দিকে চলে গেলেন।

কর্নেল আস্তে বললেন, চোর নৌকোয় চেপে গিয়েছিল!

কী ভাবে বুঝলেন?

বাংলোয় যাবার সময় স্লুইস গেটের একটু আগে বাইনোকুলারে দেখছিলুম, উজানে শিবমন্দিরের কাছ থেকে সদ্য একটা ছই দেওয়া নৌকো মাঝগঙ্গার দিকে চলেছে। দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটারের বেশি। চাদর মুড়ি দিয়ে চোর নৌকোর হাল ধরে বসে আছে। হিউজেসগঞ্জে ফিরে চলেছে।

তার চেহারা দেখতে পেয়েছেন কি?

কর্নেল হাসলেন। নাহ্‌। মারুতি ততক্ষণে বাঁক নিয়ে নিচের রাস্তায় নেমে গেছে। আমি তখন কেমন করে জানব সে সাধনবাবুর ঘরে হানা দিতে গিয়েছিল? হর মালীর মুখে ঘটনাটা শোনার পর বুঝলুম সেই নৌকোয় চোর গিয়েছিল এবং দূরে আমাদের গাড়ি দেখামাত্র চাদরমুড়ি দিয়েছিল।

কাল বলছিলেন, নৌকোতে খুনীর মাথা—

কর্নেল চোখ কটমট করে বললেন, তোমার মুণ্ডু!

মোহনজি এসে বললেন, আধঘণ্টার মধ্যে লাঞ্চ রেডি হয়ে যাবে। এখন বারোটা বাজে। তো মাথামুণ্ডু না কী বলছিলেন কানে এল?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, সাপের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

বিশেষ প্রজাতির ভ্যাম্পায়ার। মোহনজি চেয়ারে বসে বললেন। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনা করছিলুম। আপনিই তো বলেন, প্রকৃতিতে রহস্যের সীমা নেই।

হ্যাঁ। তবে ভ্যাম্পায়ার শুনলেই ড্রাকুলার কথা মনে পড়ে যায়।

মোহনজি হেসে উঠলেন। যা বলেছেন! কে বলতে পারে কাউন্ট ড্রাকুলার মতো গঙ্গাভবনের প্রতিষ্ঠাতা আমার পূর্বপুরুষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহও ভ্যাম্পায়ার হয়েছেন?

রাজু পিছন থেকে বলল, আভি পুলিশের জিপগাড়ি ইরিগেশন বাংলোমে গেল।

গেল নাকি? মোহনজি উঠে দাঁড়ালেন। কর্নেলসায়েব! আপনারা স্নান করে নিন। আমি গিয়ে দেখে আসি কী ব্যাপার। তা ছাড়া হর লোকটি গোবেচারা। পুলিশ আবার তাকে ধরে না পেটায়!

বলে মোহনজি বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মারুতি গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভার একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। সে দৌড়ে এসে গাড়িতে চাপল এবং স্টার্ট দিল। রাজু ছুটল গেট খুলে দিতে।

বললুম, মোহনজি লোকটি বেশ মজার!

কর্নেল বললেন, মজার লোক বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ জানি না। ওঁর সবদিকে ছোটাছুটি এবং নাক গলানোর অভ্যাস আছে। খুব চটপটে মানুষ। দরকার হলে লাঠি বা বন্দুক নিয়ে আখের জমিতে শেয়াল তাড়াতে ছোটেন!

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। টুপি বগলদাবা করে ফের বললেন, আজ আমি স্নান করব। তুমি?

বললুম, নাহ্। একটু গড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।

কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। বাংলোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তর ও পশ্চিমে সেই জলাটা দেখা যাচ্ছে। জলার উত্তরে সেচ-বাংলোর লনে পুলিশের জিপ সবে গিয়ে দাঁড়াল।

কর্নেল পোশাক বদলে স্নান করতে ঢুকলেন। সাধনবাবুর দেওয়া মার্লবরো

সিগারেটের কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাগেজ খুলে সেটা পাওয়া গেল দেশলাইসমেত। আজ সকালে প্যাকেটটা নিতে ভুলে গিয়েছিলুম।

সিগারেট ধরিয়ে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিলুম। সেই সময় পশ্চিমের জানালা দিয়ে চোখে পড়ল একটা মোটাসোটা শেয়াল সত্যি আখের ক্ষেতের দিকে চুপিচুপি চলেছে। মোহনজি থাকলে নিশ্চয় তাড়া করতেন ভেবে হাসি পেল। উনি ফিরে এলে এই খবরটা দিতেই হবে।

কিন্তু মোহনজি ফিরলেন না। সাড়ে বারোটায় রাজু এসে সেলাম ঠুকে বলল, কর্নেলসাব! ভোজন কবিয়ে লিন। পাটোয়ারিজি পুলিশের গাড়ির সঙ্গে চলিযে গেলেন।

কর্নেল স্নান কবে ততক্ষণে তৈরি। বললেন, চলো জয়ন্ত! বলেছিলুম না মোহনজির সবতাতে নাক গলানো আর ছোটাছুটির অভ্যাস আছে?

বললুম, একটু আগে ফার্মের আখের জমির দিকে একটা শেয়ালকে নেতে দেখলুম। মোহনজিকে খবর দিলে পুলিশেব সঙ্গ ছেড়ে ফার্মে ছুটে আসতেন!

কর্নেল হাসলেন। বলা কঠিন। শেয়ালের চেয়ে পুলিশ সম্ভবত এখন ওঁর কাছে জরুরি।

কেন বলুন তো?

তা জানি না। যা দেখছি, তাই বলছি।...

খাওয়ার পব অভ্যাসমতো বিছানায শুযে কম্বলমুড়ি দিয়েছি, কর্নেল তখনও চোখ বুজে চুরুট টানছেন পশ্চিমের জানালার পাশে, গাড়ির শব্দ কানে এল। তা হলে মোহনজি এতক্ষণে ফিরলেন।

কিন্তু রাজু এসে বলল, কর্নেলসাব! পাটোয়ারিজি বাড়িতে গেছেন। ড্রাইভার বলল, উনহি আপনাদের জন্য গাড়ি ভেজলেন।

কর্নেল বললেন, ঠিক আছে। ড্রাইভার যদি এখনও না খেয়ে থাকে, খেয়ে নিতে বলো। আমবা তিনটেয় বেরুব।

রাজু বাইরে গিয়ে বলল, মুকুন্দ! আভি তুমি খানা খাও। সাবলোগ তিন বাজে ঘুমতে যাবেন।

ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গিয়েছিল। আস্তে ডাকলুম, কর্নেল!

বলো।

বাজু বলছিল, গঙ্গাভবনে মোহনজির কাকা মহেন্দ্রজির প্রেতাত্মা দেখেছে!

দেখতেই পারে।

আহা! আমার কথাটা হলো, গতরাতে সে ওদিকে কিছু দেখেছে বা কোনো চিৎকার শুনেছে কি না ওকে জিজ্ঞেস করা উচিত।

হুঁ। বলে কর্নেল আবার ধ্যানস্থ হলেন।

অগত্যা ভাতঘুমে মন দিলুম। কিন্তু কখন তিনটে বেজে গিয়েছিল। কর্নেলের ডাকে ঝিমধরা শরীর নিয়ে উঠতেই হলো। তাঁর নির্দেশে প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটার-জ্যাকেট-মাফলার ইত্যাদি বর্মে সাজতে হলো। বুঝলুম, ফিরতে রাত হতে পারে।

ড্রাইভার মুকুন্দ বাঙালি। তার কাছে জানা গেল, মোহনজির অনুরোধে পুলিশ হর মালীকে ধরে নিয়ে যায়নি। সেচবাংলোয় দুজন কনস্টেবল রাখা হয়েছে। সেচ দফতরের স্থানীয় অফিসে পুলিশ খবর দেবে।

মুকুন্দের মতে, হর মালী তার চেনা লোক। সে চোর-চোট্টা নয়। তবে সাধনবাবু সম্পর্কে তার কিছু সন্দেহ বরাবর ছিল। উনি মদ খেতেন, এজন্য নয়। হাজিগঞ্জের স্মাগলারদের সঙ্গে ওঁর নাকি খুব মাখামাখি ছিল। কালীকৃষ্ণবাবুর গদি একসময় ছিল স্মাগলারদের ডেরা। পুলিশের এবং কাস্টমসের বারবার হানা কালীকৃষ্ণবাবুকে জব্দ করে ফেলেছিল। এখন উনি ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন।

কুঠির জঙ্গলের ভেতর এখনই গা ছমছম করা অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। এতক্ষণে কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, মোহনজি হঠাৎ বাড়ি চলে গেলেন কেন?

মুকুন্দ বলল, থানার ওসি-র কাছে মোহনজি খবর পেয়েছিলেন, ওঁদের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির একটা ট্রাক হাইওয়েতে অ্যাকসিডেন্ট করেছে। ট্রাকটা কোনো কোম্পানির মাল নিয়ে ফরাক্কা হয়ে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। ওঁর দুই ছেলে। একজনকে গদিতে থাকতেই হবে। অন্যজন আজ ব্যবসার কাজে কলকাতা গেছে। তাই মোহনজি গদিতে বসবেন। ছেলে যাবে অ্যাকসিডেন্টের জায়গায়।

আচ্ছা মুকুন্দ, একটা কথা।

বলুন সার!

সাপের কামড়ে তিনজন মানুষ মারা পড়ল। এ সম্পর্কে তোমার মত কী?

মুকুন্দ একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, গঙ্গাভবনের ওখানে অনেক সাপ আছে সার!

কিন্তু এখন তো শীতের সময়। শীতও পড়েছে প্রচণ্ড!

সার! শঙ্খচূড় সাপের জন্ম পাহাড়ি মুলুকে। মোহনজি দুজন বেদে ডেকে এনেছিলেন। তাদের কাছে শুনেছি, শঙ্খচূড় তাই শীতে কাবু হয় না। তাছাড়া দৈবাৎ গায়ে পা পড়লে তো দংশাবেই।

শুধু গলায় কেন?

মুকুন্দ একটু ভেবে বলল, আমি কথাটা ভেবেছি সার! আমার মতে,

যে তিনজন মারা গেল, প্রত্যেকের পরনে শীতের পোশাক ছিল। পায়ে জুতো মোজা। পরনেও প্যান্ট শার্ট সোয়েটার। কিন্তু গলার কাছটা খোলা। কাজেই গলাতেই ছোবল দিয়েছে। শঙ্খচূড় বড়ই ধূর্ত সার! হাড়ের জায়গায় কামড়ালে মুখে ব্যথা পাবে। তাই না?

কর্নেল বললেন, বাহ্! ঠিক বলেছ! তুমি বুদ্ধিমান মুকুন্দ! হ্যাঁ—মোক্ষম মার মারতে হলে খোলা গলার কাছটাই ঠিক জায়গা। রক্ত-মাংসে বিষ সহজে ঢুকে যাবে। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি, মুকুন্দ!

আমি অবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকালুম। উনি কথাগুলো মোটেও কৌতুক করে বললেন না। ওঁর মুখের ভাবভঙ্গি রীতিমতো সিরিয়াস।

আমার দিকে ঘুরে কর্নেল বললেন, এইজন্য আমি বলি জয়ন্ত, সত্য জিনিসটা অনেক ফালতু জিনিসের মধ্যে পড়ে থাকে। খুঁজে বের করতে হয়। মুকুন্দ তা করতে পেরেছে। হ্যাঁ—খোলা গলা। তা ছাড়া সেখানে রক্তবাহী শিরা-উপশিরা আছে। দ্রুত বিষ মাত্র ছ-সাত ইঞ্চি দূরে হার্টে চলে যাবে।

ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। স্বীকার করছি, এটা আমারও মাথায় আসা উচিত ছিল। এই শীতে শরীরের খোলা অংশের মধ্যে গলার একটুখানি আততায়ী সহজে নাগালে পাবে। মাফলার জড়ালেও একটু ফাঁক থেকে যাবে। শ্বাসরোধের ভয়ে কেউ তো আঁটো করে মাফলার জড়ায় না। চলাফেরার সময় মাফলার একটুখানি ঢিলে হয়ে নেমে আসে।

কর্নেল বললেন, মুকুন্দ! কয়েক মিনিটের জন্য একবার থানায় ঢুকব।

থানার সামনে গিয়ে মুকুন্দ গাড়ি দাঁড় করাল। কর্নেল নেমে গিয়ে থানায় ঢুকলেন।

নেহাত সময় কাটানোর জন্য বললুম, আচ্ছা মুকুন্দ, শঙ্খচূড় যদি পাহাড়ি সাপ হয়, তা হলে এখানে এসে জুটল কী করে?

মুকুন্দ বলল, আমি ততকিছু লেখাপড়া জানি না সার! তবে আমার সামান্য বুদ্ধিতে যা মনে হয়েছে বলি। স্লুইস গেট থেকে গঙ্গার বাঁধ ধরে প্রায় এক কিলোমিটার গেলে ইটের চাঙড়ের মধ্যিখানে একটা মস্তবড় বটগাছ দেখতে পাবেন। ওটা একসময় শিবমন্দির ছিল। এখন, শঙ্খচূড় হলো শিবের মাথার ভূষণ। মন্দির নেই। থাকার জায়গা নেই। শিবকে তুলে নিয়ে এসে গঙ্গাভবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাটোয়ারিজির পূর্বপুরুষ। রাতারাতি ধস ছেড়ে সেই নতুন মন্দির আর শিব গেলেন গঙ্গার বুকে তলিয়ে। এদিকে মা-গঙ্গার পতি হলেন শিব। পতি পত্নীকে ছেড়ে ওঠেন কী করে? তো—

গল্পটা বড্ডবেশি পৌরাণিক হয়ে যাচ্ছে দেখে তার কথার ওপর বললুম,

বুঝেছি। এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এখানে এসে শুনেছি, মোহনজির এক কাকা নাকি স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ভেসে যান।

মুকুন্দ বলল, সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম সার!

বলো! শোনা যাক।

মোহনজির কাকা ছিলেন মহেন্দ্রজি। তিনি ইচ্ছে করেই ভেসে গিয়েছিলেন গঙ্গায়। ও মা গঙ্গা! আমার পূর্বপুরুষের দেবতা ফিরিয়ে দে! নৈলে এই আমি তোর সঙ্গে চললুম।

ওঁরা তো রাজপুত।

হলে কী হবে সার? ওঁদের আদি গৃহদেবতা ছিলেন শিব। আর এখন তো ওঁরা বাঙালি হয়ে গেছেন। দুর্গাপুজো-কালীপুজো সব পুজোই করেন।

মহেন্দ্রজি ফিরে পেয়েছিলেন দেবতাকে?

মুকুন্দ চাপা স্বরে বলল, এ খুব গোপন কথা সার! মহেন্দ্রজিকে মা গঙ্গা বললেন, তুই আত্মবিসর্জন দিয়ে আমার পতিকে নিয়ে যা। উনি তাই করলেন।

তার মানে?

মহেন্দ্রজির আত্মা শিবকে পেলেন। মাঝে মাঝে রাতবিরেতে তিনি গঙ্গাভবনে প্রদীপ জ্বেলে শিবপুজো করেন। এক রাত্রে গাড়ি নিয়ে ফার্মে যাবার সময় আমি স্বচক্ষে গঙ্গাভবনে আলোর ছটা আর সাধুবেশী মহেন্দ্রজিকে দেখেছি সার! বলে ড্রাইভার করজোড়ে চোখ বুজে প্রণাম করল।

এই সময় কর্নেল এসে গেলেন। গাড়িতে ঢুকে বললেন, চলো মুকুন্দ! জমিদারবাড়ি যাব।

মুকুন্দ জিজ্ঞেস করল, চন্দ্রনাথবাবুর বাড়ি সার?

হ্যাঁ। একটু তাড়াতাড়ি যেতে পারবে কি না দেখ। তবে সাবধানে গাড়ি ড্রাইভ করো।...

।। সাত ।।

মুকুন্দ দক্ষ ড্রাইভার। শেষ বেলায় রাস্তায় অসংখ্য সাইকেল রিকশ, টেম্পো, ম্যাটাডোর, ট্রাক, বাস আর মানুষজনের গাদাগাদি ভিড়। মাঝে মাঝে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য জ্যাম। অবশেষে বুঝতে পারলুম, কেন কর্নেল সাবধানে যেতে বলেছিলেন। যখন-তখন গাড়ির সামনে আচমকা লোক এসে পড়ছে। যানবাহনকে কেউ গ্রাহ্য করছে না।

মুকুন্দ বলল, এটাই মেন রোড সার! এই সময়টা তাড়াতাড়ি এ রাস্তায় যাওয়া কঠিন। তার চেয়ে একটু ঘুরপথে গেলে ভাল হয়।

কর্নেল বললেন, তাই চলো! চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। উনি সাড়ে চারটে নাগাদ বিশেষ কাজে বেরিয়ে যাবেন। তার আগে পৌঁছানো দরকার।

মুকুন্দ বাঁদিকে একটা গলিতে গাড়ি ঢোকাল। ঘিঞ্জি ঘোরালো গলি। এখনই গলির দুপাশে আলো জ্বলে উঠেছে। গলিতেও ভিড় ছিল। অনেক ঘুরে অপেক্ষাকৃত কম ভিড়েব একটা রাস্তায় পৌঁছে মুকুন্দ বলল, জমিদারি এলাকা শুরু হলো। এখন সব মারোয়াড়ি আর রাজপুত ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়েছে। বাড়ি করেছে। গোডাউন করেছে।

এবার দুধারে আমবাগান পড়ল। কর্নেল বললেন, চন্দ্রনাথবাবুর শখেব বাগান। এই রাস্তার শেষে ওঁর বাড়ি। একেবারে গঙ্গার মাথায়।

বললুম, গঙ্গার ধস ছেড়ে তাহলে জমিদারবাড়িরও খানিকটা ভেঙে গেছে বলুন?

নাহ্। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান বাড়িটাকে বাঁচিয়েছে। বাঁধ আছে এবং বাঁধের বুকে পাথরের চাঙড় ফেলা হয়েছে। চন্দ্রনাথবাবু আমাকে সব দেখিয়েছেন।

আমবাগানের শেষদিকটায় আলো দেখা যাচ্ছিল। গাড়ির হেডলাইটে ক্রমশ একটা পুরনো ধূসব রঙের গেট চোখে পড়ল। গেটেব মাথায় বুগেনভিলিয়ার ঝাড়। তাব তলায় একটা বাল্‌ব ঝুলছে।

গাড়ির হর্ন শুনে একটা লোক গেট খুলে দিল। সে সেলাম ঠুকে কর্নেলকে বলল, বাবু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন সার!

দুধারে অন্ধকারে ঝোপঝাড় গাছপালার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এবড়োখেবড়ো খোয়া বিছানো রাস্তাটা ঘুরে পোর্টিকোর তলায় ঢুকেছে। দেখলুম, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে প্যান্ট-সোয়েটার-কোট। মাথায় টুপি এবং গলায় মাফলার জড়ানো। পাকানো সাদাকালো গোঁফ এবং চিবুকে সাদা একটুখানি দাড়ি। মুখে পাইপ।

তিনি কর্নেলকে বললেন, পাটোয়া-রিজির গাড়ি মনে হচ্ছে? বাহ্। আমি একটু লিফ্‌ট্ পাব আশা করি! কারণ আমার মোটরবাইক হঠাৎ বিগড়েছে। আমাকে পায়ে হেঁটে গিয়ে রিকশ ধরতে হতো।

কর্নেল নেমে গিয়ে বললেন, জয়ন্ত, ইনিই বিখ্যাত শিকারি চন্দ্রনাথ চৌধুরী। তোমার কথা ওঁকে আগেই বলেছি।

নমস্কার করলুম। চন্দ্রনাথবাবু বললেন, ভেতরে আসুন। আমি মশাই বুনো লোক। বনেজঙ্গলেই জীবন কেটেছে। ফরম্যালিটির ধার ধারি না।

বসার ঘরটা বেশ বড়। ঘরভর্তি স্টাফকরা বুনো জন্তুর মাথা এবং শরীর। এককোণে টেবিলের ওপর একটা স্টাফকরা আস্ত চিতাবাঘ। দেয়ালে একটামাত্র টিউব লাইট জ্বলছে। তাই ঘরটা কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে। সোফায় বসে চন্দ্রনাথবাবু বললেন, কফি-টফি খাওয়াতুম। কিন্তু সময় কম। কিছু মনে করবেন না কর্নেলসায়েব। তো বলুন কী ব্যাপার?

সেচবাংলোর কেয়ারটেকার বেচারা—

কর্নেলের কথার ওপর চন্দ্রনাথবাবু বললেন, উঁহু। মোটেও বেচারা নয়। ওকে আপনি চিনতেন বাইরে-বাইরে। আমি চিনতুম ভেতরে-ভেতরে। যেমন কর্ম তেমনি ফল পেয়েছে। বলুন!

কাল রাত এগারোটায় সাধনবাবু আপনার বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন শুনলুম।

হ্যাঁ। দাবা জমে উঠেছে, হঠাৎ ব্যাটাচ্ছেলে পশুপতি এসে ওকে ডাকল।

পশুপতি কে?

কালীকৃষ্ণবাবুর গদিতে খাতা লেখে। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার আগ্রহের কারণ? কিছু মনে করবেন না কর্নেল সায়েব! আমার তো দেখেছেন, সবসময় স্ট্রেটকাট কথাবার্তা!

বুঝতে পারছিলুম, চন্দ্রনাথবাবুর পেটে কিঞ্চিৎ উত্তেজক পানীয় পড়েছে। আমরা না এলে হয়তো পুরো ডোজ পান করেই বেরুতেন।

কর্নেল হাসলেন। এইজন্যই আপনাকে আমার পছন্দ। আপনিই পারেন এই শঙ্খচূড় রহস্যের মীমাংসা করতে।

চন্দ্রনাথবাবুও হাসলেন। রহস্য! বলেছেন ভাল। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না এতে আপনার কী স্বার্থ?

আপনি ভুলে গেছেন চন্দ্রনাথবাবু! আমার কার্ডে লেখা আছে নেচারোলজিস্ট্। প্রকৃতিই আমার চিন্তাভাবনার বিষয়। তাই এভাবে মাঝে মাঝে ফিল্ডে নামতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, শীতে বিষাক্ত সাপে কামড়ানোর ঘটনা খুব বিরল। তাই আমি শঙ্খচূড় রহস্যের ব্যাপারটা বুঝতে চাই।

যথেষ্ট, যথেষ্ট! বুঝে গেছি। হাত তুলে ফণার মতো করে চন্দ্রনাথবাবু বললেন, কর্নেল সায়েব! বিষাক্ত সাপের গায়ে মানুষ পড়লে সে ছোবল দেবেই। এই একটা কথা আপনি কেন বুঝতে পারছেন না জানি না।

ঠিক আছে। আর একটা কথা।

বলুন!

মোহনজির কাকা মহেন্দ্রজিকে আপনি তো চিনতেন?

হুঁউ। ধর্মকর্মের বড্ড বেশি বাতিক ছিল। তাই সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন।

সে কী! উনি গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে নাকি ভেসে যান?

চন্দ্রনাথবাবু আবার হাসলেন। গুজব! স্রেফ গুজব! মোহনজি কী বলেছেন আপনাকে?

গঙ্গায় ডুবে মরেছিলেন। বডি পাওয়া যায়নি।

বোগাস! আমি মশাই বনজঙ্গলে ঘোরা লোক। আজকাল আব তত জঙ্গল নেই। কবছর আগে দোগাছিয়ার কাছে জঙ্গলের ভেতর যে শিবমন্দির আছে—আছে, মানে ছিল—এখন ধ্বংসস্তূপে বটগাছ গজিয়েছে, সেখানে মহেন্দ্রজিকে দেখেছি। ধ্যানে মৌনী সাধু। ধ্যান ভাঙালুম না। কিন্তু চিনলুম।

মোহনজিকে বলেছিলেন?

কী দবকার? আসল কথাটা বলি। চন্দ্রনাথবাবু চাপা স্বরে বললেন, গঙ্গাভবনে ওঁদের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠা করা সোনাব শিবলিঙ্গ ছিল। তার গায়ে ফণাতোলা সাপ। সেটাও খাঁটি সোনার। মহেন্দ্রজির সন্দেহ ছিল, সেই সোনার দেবতা মোহনজি লুকিয়ে রেখেছেন। তাই নিয়ে মনোমালিন্য। শেষে মহেন্দ্রজি মনের দুঃখে সাধু হয়ে যান। মোহনজিকে আপনি তো এসব কথা বলতে পাববেন না। আপনি তাঁর গেস্ট হয়েছেন।

চন্দ্রনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখে বললেন, আমার সময় হয়ে গেছে।

কর্নেলও উঠে দাঁড়ালেন। চন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে বললেন, কী রে মুকুন্দ? কেমন আছিস? চল্! বড রাস্তা অব্দি তোর পাশে বসে যাই।

মুকুন্দ নমস্কার করে বলল, আসুন!

যেতে যেতে চন্দ্রনাথবাবু মুখ ঘুরিয়ে কর্নেলকে বললেন, সাধনকে আমি অনেকবার সাবধান করে দিয়েছিলুম, দাগী হারামজাদাদের সঙ্গে মেলামেশা কোরো না।

কর্নেল বললেন, কিন্তু সাধনবাবু তো বিষাক্ত সাপের কামড়ে মারা পড়েছেন!

তা ঠিক। তবে অত রাত্রি পর্যন্ত টাউনে তাব থাকা উচিত ছিল না। আমি তো ওকে মোটরবাইক আর বন্দুক নিয়ে বাংলোতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলুম। ও ব্যাটাচ্ছেলে পশুপতির ডাকে গেল কেন মদের আড্ডায়?

বড় রাস্তায় একখানে মুকুন্দকে গাড়ি থামাতে বলে চন্দ্রনাথ নামলেন। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বাইবে কোথাও যাচ্ছেন চন্দ্রনাথবাবু?

হ্যাঁ। বলে চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হলেন।

মুকুন্দ মুচকি হেসে বলল, বাজি রেখে বলতে পাবি সার! বাবু গেলেন কারও বাড়ি দাবা খেলতে। ওঁর বাড়িতে দাবা খেলতে সহজে কেউ যেতে চায় না। কেন জানেন? খেলতে খেলতে খামোকা ঝগড়া করেন। আব

ওই মদ! মদ যে খায় না, তাব সঙ্গে বাবু দাবা খেলবেন না। তো এবার কোথায় যাবেন সাব?

একপাশে গাড়ি দাঁড করাও। আমি আসছি। জয়ন্ত! একটু অপেক্ষা করো!

গাডি একটা বড় ওষুধের দোকানেব ধারে দাঁড় করিয়েছিল মুকুন্দ। কর্নেল সেই দোকানের পাশে একটা গলিবাস্তায় ঢুকে গেলেন।

মুকুন্দ বলল, এই যে ওষুধের দোকান দেখছেন সার! এটা কালীকেষ্টবাবুর ছোটভাই হরেকেষ্টবাবুর। দুই ভাইয়ে বনিবনা নেই। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-ফ্যাসাদ খুব হযেছে! কিন্তু কালীকেষ্টবাবু লোক ভাল। হবেকেষ্ট হাড়ে বজ্জাত লোক। মুকুন্দ ফের চাপা স্ববে বলল, চোরাই ড্রাগেব কারবার করত। পুলিশ একবার ধরেছিল। টাকাকডি দিয়ে বেঁচে যায়। শেষে তরুণ সংঘ ক্লাবের ছেলেরা পেছনে লাগল। তাদেব ভয়ে এখন জব্দ হয়েছে।

বললুম, হিউজেসগঞ্জে নাকি সববকম বিদেশি জিনিস পাওয়া যায়?

তা যায়। তবে দালাল ধরতে হয। কবছর থেকে সরকাব খুব কডাকড়ি করছেন কিনা!

মুকুন্দ সবিস্তারে চোরাচালানের কথা বলতে থাকল। সর্বত্র যা ঘটছে, এখানেও তাই। বিশেষ করে বর্ডার এখান থেকে বেশি দূরে নয। মুকুন্দের কাছে জানা গেল, পদ্মা থেকে রাতের অন্ধকাবে চোরাই জিনিস নদীনালা দিয়ে এসে পৌঁছায়। আবার এখান থেকেও অনেক জিনিস বর্ডার পেরিয়ে চলে যায।

মিনিট পনের পবে কর্নেল ফিবে এসে গাড়িতে ঢুকলেন। বললেন, চলো মুকুন্দ! থানায় যাব আবাব। সেখান থেকে তোমাদের মালিকের ফার্মহাউসে ফিরব।

আস্তে বললুম, কোথায় গিয়েছিলেন বলতে অসুবিধে আছে?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, নাহ্। অশোক সোম বুধ শনি এই তিনদিন গলির ভেতর একটা চেম্বারে চারটে থেকে ছটা অব্দি বসে। নার্সিংহোম করার আগে সে ওখানেই বসত। কাজেই এখনও বসতে হয়। কাছেই বড় ওষুধের দোকান কমলা ফার্মেসি। রোগীদের সুবিধে হয়।

দোকানটা কার আমি কিন্তু জেনে গেছি।

মুকুন্দের কাছে তো?

এতক্ষণে কর্নেলের মুখে হাসি ফুটল। বললুম, আরও কিছু জানি।

দু ভাইয়ের বিরোধ।

আপনি জানেন?

মুকুন্দের কানে গিয়েছিল কথাটা। সে বলল, একথা সার রাজ্যসুদ্ধু জানে।

কর্নেল সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে মুকুন্দকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মুকুন্দ, হরেকৃষ্ণবাবুকে আমি দেখিনি। কী বয়সের লোক?

মুকুন্দ বলল, আজ্ঞে সার, চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। দেখলে বুঝতেই পারবেন না—

আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি!

বলুন সার!

হরেকৃষ্ণবাবুর মাথার চুল নাকি লাল?

মুকুন্দ হেসে উঠল। হ্যাঁ সার! চুলের হিস্ট্রি আছে একটা।

বলো!

প্রথম পক্ষের বউ মারা গেলে ফের বিয়ে করেছেন। এদিকে চুলে পাক ধরেছে ওই বয়সেই। কেন জানেন? বেশি মদ খেলে চুল শীগগির পেকে যায়।

ঠিক বলেছ।

হরেকেষ্টবাবু চুলে কী বিলিতি কলপ মাখতেন। শেষে চুল খাপচা-খাপচা উঠে গেল। বাকিটুকু লাল হয়ে গেল। রাগ করে কলপ ছেড়ে দিলেন। অশোকবাবুর কাছে চিকিৎসা করেও কিছু হলো না। মাথা ন্যাড়া করেছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার সার! আবার লাল চুল বেরুল।

বললুম, পরচুলা পরেন না কেন উনি? আজকাল সুন্দর পরচুলা কিনতে পাওয়া যায়।

মুকুন্দ হাসতে হাসতে বলল, লোকে ঠাট্টা করবে না? একি আপনাদের কলকাতা সার? টাউন হলেও পাড়াগাঁয়ের স্বভাব।

থানার সামনে গিয়ে সে গাড়ি দাঁড় করাল। কর্নেল বললেন, এবার সঙ্গে আসতে পারো জয়ন্ত! শঙ্খচূড় রহস্য সবিস্তারে লিখতে হলে তোমার আসা দরকার।...

ও সি রমেন্দ্র মণ্ডল বললেন, আসুন কর্নেলসায়েব! পাঁচ মিনিট পরে এলে আমাকে আর পেতেন না।

কর্নেল বললেন, শঙ্খচূড়ের পাল্লায় পড়তেন বুঝি?

রমেন্দ্রবাবু বিকট হা হা হেসে বললেন, কিছু বলা যায় না। দোগাছিয়ায় জমির ফসল নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছে। এক গাড়ি ফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছি। দুজন অফিসারও গেছেন। এখন একা গঙ্গাভবনের সামনে দিয়ে আমার যাওয়ার কথা। কাজেই সাধনবাবুর মতো—যাক্ গে। কফি বলি?

থ্যাঙ্কস্। ফার্মহাউসে ফিরে কফি খাব। একটা কথা জানতে এলুম।

বলুন!

সাধনবাবুর স্ত্রী বাংলোর কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে কোনো জিনিস চুরি যাওয়াব কথা বলেছেন?

এখন অব্দি বলেননি। এস আই অমলবাবু সাধনবাবুর ভাই এবং আরও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে লক্ষ্মীরানী দেবীকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। অমলবাবু টেলিফোনে একটু আগে জানালেন, এখনও ভদ্রমহিলা সুস্থ হতে পারেননি। তাই ধৈর্য ধরে অমলবাবু ওখানে অপেক্ষা করছেন।

ইরিগেশন অফিস থেকে কেউ বাংলোর চার্জ বুঝে নিতে যাননি?

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নীরদবাবু গেছেন। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্যানার্জি এখনও ফেরেননি বাইরে থেকে।

মর্গের ডাক্তারবাবুর ফাইনাল রিপোর্ট পেয়ে গেছেন?

হ্যাঁ। ফাইনাল রিপোর্ট পেয়েই বডি দাহ করার অনুমতি দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু কোনো নতুন পয়েন্ট দিয়েছেন?

রমেন্দ্রবাবু মাথা দোলালেন। নাহ্। ওঁর বক্তব্য হলো, ছোবল দিলেও সব সময় সাপের বিষদাঁত ভাঙে না। দাঁত ভেঙে ক্ষতস্থানে আটকে থাকাটা নির্ভর করে কতকগুলো অবস্থার ওপর। বরং একটা জেরক্স কপি আপনাকে আমি পাঠিয়ে দেব।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ডাক্তার অধিকারী কী করে নিশ্চিত বলেন যে রক্তে সাপেরই বিষ আছে? সাপের বিষের উপাদান পরীক্ষা করার মতো ল্যাবরেটরি তো হাসপাতালে নেই।

অফিসার-ইন-চার্জ বললেন, সমস্যা হল, আমাদের ওঁর রিপোর্ট মেনে নিতেই হবে, যতক্ষণ না কেউ চ্যালেঞ্জ করছে। চ্যালেঞ্জ করলে কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবে রক্তের নমুনা পাঠাতুম।

কর্নেল বললেন, যাকগে। যা হবার হয়ে গেছে। আপনি কি দোগাছিয়া যাবেন?

যাব।

তাহলে আমাদের গাড়ির সঙ্গে চলুন। কয়েক মিনিটের জন্য সেচবাংলোয় যাব। আপনিও যাবেন।

কী ব্যাপার?

চলুন তো। আমার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। যথাস্থানে বলব।

পুলিশের জিপকে অনুসরণ করল আমাদের মারুতি। কর্নেল মুকুন্দকে বললেন, আমরা সেচবাংলোয় যাব। তারপর সেখান থেকে ফার্মহাউসে ফিরব।

সেই ভয়ঙ্কর নির্জন জঙ্গল আর গঙ্গাভবন পেরিয়ে যাবার সময় দুপাশে যেন হাজার-হাজার শঙ্খচূড়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলুম। হেডলাইটের আলোর

দুপাশে শুকনো পাতার স্তূপে সন্ধ্যার হিম বাতাস সাপের মতোই হিস হিস শব্দে গর্জন করছিল।

সেচবাংলোর সামনে গিয়ে হর্ন দিতেই শ্রীধব গেট খুলে দিল। তার চেহারায় আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। সেচ দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নীরদবাবু পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর অমলবাবুর সঙ্গে পেছনের অফিসঘরে বসে গল্প করছিলেন।

আমাদের দেখে ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন। বমেন্দ্র মণ্ডল জিজ্ঞেস করলেন, অমলবাবু? মিসেস ভট্টাচার্য কি জানিয়েছেন কিছু চুরি গেছে কি না?

না। ভদ্রমহিলার ঘনঘন ফিট হচ্ছে। ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিলুম। সাধনবাবুর ভাই বললেন, কিছুক্ষণ পরে ঠিক হয়ে যাবে। বউদির হিস্টিবিয়া আছে।

রমেন্দ্রবাবু বললেন, বলুন কর্নেল! কী কথা মনে পড়েছে আপনার?

কর্নেল বাঁদিকে র‍্যাকের কাছে এগিযে গেলেন। তারপর বললেন, এই ফাইল দুটো লাইন থেকে বেবিয়ে আছে। থানায সাধনবাবুব কোয়ার্টারে চুরিব খবর জানাবার সময চোখে পড়েছিল। কিন্তু গ্রাহ্য করিনি। দেখা যাক, এ দুটোর অবস্থা এমন কেন?

বলে কর্নেল দুটো ফাইলই টেনে বের করলেন। দেখা গেল একটা আনুমানিক ছ ইঞ্চি-পাঁচ ইঞ্চি সাইজের নীলবঙেব ছোট্ট বাক্স দাড করানো আছে। দেখতে ঠিক গযনাব বাক্সেব মতো। কালো মোটা সুতো দিযে বাঁধা শিসবোর্ডেব বাকসোটা খুলে দেখা গেল একটা বাঙিন কাগজেব মোড়ক। মোড়ক খোলাব পর ঘবসুদ্ধু আমবা চমকে উঠলুম। বমেন্দ্র মণ্ডল বললেন, কী সর্বনাশ! এটা যে সাপের ফণা মনে হচ্ছে!

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। সোনাব সাপেব ফণা। চোব এটাই হাতাতে এসেছিল। ব্যর্থ হযে ফিবে গেছে। আর এটাব জন্যই সাধনবাবু বিশ্বাসঘাতকতাব শাস্তি পেযেছেন।

।। আট ।।

সোনার সাপেব ফণাটা দেখেই আমার মনে পডেছিল চন্দ্রনাথবাবুর কথা। উনি পাটোযাবিজিদের গৃহদেবতা সোনার শিবলিঙ্গে জডানো সাপের কথা বলেছিলেন। এটাই তাহলে সেই সাপ। পুরো সাপটা নয়। লিঙ্গ থেকে ফণার অংশটা ভেঙে নেওয়া হয়েছে। অনুমান করেছিলুম, ফণাটা নিরেট সোনার এবং বেশ ভারী।

সোনাব সাপের ফণাটা অমলবাবুব জিম্মায় দিযে ও সি মিঃ মণ্ডল তাঁকে

থানায় ফিরতে বলেছিলেন। কনস্টেবলরাও অমলবাবুর সঙ্গে ফিরে গিয়েছিল। ও সি কর্নেলের সঙ্গে একান্তে কিছু আলোচনা করে দোগাছিয়া রওনা হয়েছিলেন।

ফেরার পথে কর্নেল ড্রাইভার মুকুন্দকে কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, পশুপতি কতদিন থেকে কালীকৃষ্ণবাবুর গদিতে কাজ করছে জানো?

মুকুন্দ বলেছিল, বছর দুই হবে হয় তো।

তার আগে সে কী করত?

আঢ্যি জুয়েলার্সে স্বর্ণকারের কাজ করত। চুরি করেছিল শুনেছি। তাই চাকরি যায়। আসলে ওর বাবা আঢ্যিবাবুদের কাজ করত। বাবার খাতিরে ওকে পুলিশে দেননি ওঁরা।

এখন সে গদিতে খাতা লেখে। তার মানে, লেখাপড়া ভালই জানে?

মুকুন্দ হেসেছিল। না সার! আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। ক্লাস এইট অব্দি দুজনেরই বিদ্যা। গদিতে বাংলায় হিসেবের খাতা লেখা এমন কী কাজ! কিন্তু আর বেশিদিন এই চাকরি তার বরাতে নেই। আমি বলে দিচ্ছি!

কেন?

প্রথম কথা, পশুপতি রাতের বেলায় মদ না খেয়ে থাকতে পারে না। তার চেয়ে খারাপ কথা, কালীকেষ্টবাবুর ভাই হরেকেষ্টবাবুর বাড়িতে ওর মদের আড্ডা। কালীকেষ্টবাবুর কানে গেলেই ওর চাকরি যাবে।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বলেছিলেন, তাহলে পশুপতি স্বর্ণকারের কাজ জানে!

ভাল জানে। কিন্তু হাজিগঞ্জে ওকে এ কাজ আর কেউ কি দেবে? আঢ্যিবাবুদের ঘরে যার চুরির বদনাম হয়েছে, তাকে অন্তত এখানে কেউ স্বর্ণকারের কাজ দেবে না।...

ফার্মহাউসের বাংলোয় ফিরে কর্নেল কড়া কফি আনতে বললেন রাজুকে। কিছুক্ষণ পরে রাজু কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে এল।

কর্নেল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মোহনজি টেলিফোন করেননি?

করেছিলেন সার! আমি আপনাকে সেই বাত আভি বলত। তো আপনি নিজেই পুছ করলেন। বলে রাজু হাসল। হাঁ—উনহি আজ রাতে বাংলোতে আসবেন না। কাল সুবামে আসবেন। মুকুন্দকে বলতে হবে। সুবামে উনহিকে লিয়ে আসবে।

কর্নেল কফি খেতে খেতে বললেন, রাজু! আজ রাতে আমি ক্যামেরায় প্যাঁচার ছবি তুলতে বেরুব। তুমি রাত বারোটায় আমাকে গেট খুলে দেবে। তোমাকে ডেকে ঘুম থেকে ওঠাব। কেমন?

আমি জেগে থাকব সার! লেকিন—

তার কথার ওপর কর্নেল বললেন, কেন? গতবছর এসে রাত দুপুরে পেঁচার ছবি তুলতে বেরিয়েছিলুম। ভুলে গেলে?

না সার! লেকিন এখন সাঁপের ডর করতে হবে! বাংলোর সাধনবাবুকে কাল রাতে সাঁপ জানে মেরে দিল! বহত্ খতরনাক সার।

তোমার চিন্তাব কারণ নেই। আমি সাপের মন্ত্র জানি।

রাজু অবাক চোখে তাকিয়ে চলে গেল।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, কী বুঝছ বলো জয়ন্ত?

বললুম, সোনার দেবতা আর পশুপতি স্বর্ণকার। শুধু এটুকুই বুঝেছি।

বাকিটা যথাসময়ে বুঝবে। কর্নেল চুরুট ধরালেন। তারপর আপন মনে বললেন, চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গিয়েই সাধনবাবুর প্রাণ গেছে। কিন্তু আমার ধারণা, সোনার সাপের ফণা চুরিতে তাঁকে পশুপতিই সাহায্য করেছিল। নিশ্চয় সময়মতো আধাআধি বখরার শর্ত ছিল।

কর্নেল! এতকাল পরে মহেন্দ্র সিংহের আবাধ্য দেবতার হদিস ওরা কী করে পেল? দেবতা নাকি বহুবছর আগে মন্দিরের সঙ্গে গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছিলেন!

এর উত্তর এখনও দেওয়া যাচ্ছে না। বলে কর্নেল চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন।

একটু ভেবে নিয়ে বললুম, চন্দ্রনাথবাবুর কথায় বোঝা যায়, মহেন্দ্রজি তাঁর ভাইপো মোহনজিকে সন্দেহ করেছিলেন!

কর্নেল চুপ করে থাকলেন। বুঝলুম, এখন ওঁর ধ্যান ভাঙানো যাবে না।...

রাত নটায় খাওয়ার পর ঘরে এসে কর্নেল বললেন, ঘুম এলে ঘুমিয়ে নিতে পারো। রাত বারোটায় কিন্তু ওঠাব।

উত্তেজনা চেপে বললুম, ঘুমোব না। আপনার প্যাঁচার ছবি তোলা দেখতেই হবে।

কর্নেল হাসলেন। রাজুর ভাষায় কিন্তু 'বহত্ খতরনাক' ব্যাপার। গলায় আঁটো করে মাফলার জড়িয়ে নিয়ো। শঙ্খচূড় সাপ যেন গলার কোনো অংশ খোলা না পায়।

একটু পরে রাজু এসে বলল, আপনার টেলিফোন কর্নেলসাব!

মোহনজির নাকি?

না। কোই আজিব আদমি! বলল, কর্নেলসাবকে দাও। বাত করব।

কর্নেল তার সঙ্গে চলে গেলেন। বাংলোর সামনের অংশে বসার ঘরে

টেলিফোন আছে। আমি ইংরেজি থ্রিলার বইটার পাতা খুলে বসলুম। কিন্তু মনের ভেতর শুধু শঙ্খচূড়ের সোনালি ফণা ছায়া ফেলছিল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলুম।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ফিরে এলেন। জিজ্ঞেস করলুম, কেউ হুমকি দিল নাকি?

বৃদ্ধ রহস্যভেদী হাসলেন। হুমকি বলা চলে। তবে আমাকে নয়। ও সি রমেন্দ্র মণ্ডল শঙ্খচূড় সাপটাকে এক গুলিতে ছাতু করে ফেলবেন।

বললুম, তার মানে আপনি আজ রাতে রীতিমতো একটা অভিযানে বেরুচ্ছেন?

হুঁউ। তবে জানি না, সাপটাকে দেখতে পাব কি না। সে প্রচণ্ড ধূর্ত।

আচ্ছা কর্নেল, নৌকোয চাদব মুডি দিয়ে যে শুযেছিল—মানে, মৈত্রেয়ীকে যে লোকটা—

চুপ। দেয়ালেব কান আছে। বলে কর্নেল বাথরুমে ঢুকলেন।...

সময় কাটছিল না। চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে এগিযে যেতে সময়ও যেন বড্ডবেশি দেরি করছিল। বরাবর আমার এটা হয়। কর্নেল যখন বহস্যের শেষ পর্দাটি তুলতে পা বাড়ান, তখন আমার সারা শরীব জুড়ে অস্বস্তিকর একটা উত্তেজনার স্রোত বইতে থাকে।

অবশেষে রাত বারোটা বাজল। তখন ঘরের আলো নিভিয়ে এবং দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আমরা গেটের দিকে এগিয়ে গেলুম। সারা ফার্মহাউস স্তব্ধ। এ বাতে কুয়াশা জমেছে ঘন হয়ে। ফার্মহাউসের বাতিগুলো ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। গেটের পাশের ঘরে রাজু জেগে ছিল। গেট খুলে দিয়ে চাপা গলায় কর্নেলকে সে সাবধান করে দিল আবার। হোঁশিয়ারিসে যাইয়ে সার! তারপর আরও আস্তে সে বলল, আমার ভি আপনাদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা কবে। লেকিন পাটোয়ারিজি শুনলে মুশকিল হবে। ফার্মেব জিম্মাদারি আমার হাতে।

পায়ের কাছে খুদে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে কর্নেল হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেচবাংলোগামী রাস্তায় পৌঁছে ওঁর টর্চ নিভে গেল। অন্ধকার এবং কুয়াশায় অন্ধের মতো ওঁকে অনুসরণ করছিলুম।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে রাতপাখির ডাকের মতো তিনবার শিস দিলেন। তারপর সামনের দিকে কোথাও তেমনি তিনবার শিসের শব্দ কানে এল। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, আমাকে পেছন থেকে ছুঁয়ে এস। তাহলে আছাড় খাবে না। আর—ভুলেও যেন টর্চ জ্বালবে না।

কিছুটা চলার পর বুঝতে পারলুম, গঙ্গাভবনের দক্ষিণে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছি। গাছপালা থেকে শিশির ঝরে পড়ছে। ভেজা শুকনো পাতায

সাবধানে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল বাঁদিকে ঘুরলেন। এবার বুঝলুম, আমারা গঙ্গাভবনে যাচ্ছি। অজানা আতঙ্কে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কর্নেল ঘুরে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, সাবধান। পা হড়কে আছাড় খেয়ো না। ভাঙা পাঁচিলের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে হবে।

ঘাস আর আগাছার জঙ্গলে ভরা উঠোনে পা দিয়েই চমকে উঠেছিলুম। কোথায় ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে। কর্নেলের হাত টেনে ধরলুম। কর্নেল আগের মতো ফিসফিস করে বললেন, সাবধানে বারান্দায় উঠবে। পা যেন স্লিপ করে না।

ও কিসেব গর্জন?

সাপের।

আবার আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ক্রমশ ফোঁস ফোঁস শব্দটা জোরালো হচ্ছে। সত্যিই শঙ্খচূড় সাপটা কি ক্রোধে গর্জন করছে? বেজির সঙ্গে বিষধর সাপের যুদ্ধে ঠিক এইরকম ফোঁসফোঁস শব্দ শোনা যায়। ফিল্মে দেখেছিলুম।

কর্নেল এতক্ষণে পায়ের কাছে টর্চ জ্বেলে একটা ঘরের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে ঢুকলেন। সেই ঘরেব মেঝেতে হঠাৎ কেউ একপলকের জন্য আলো ফেলে টর্চ নিভিয়ে দিল। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, মিঃ মণ্ডল! আগেই এসে গেছেন দেখছি।

ও সি রমেন্দ্র মণ্ডলও ফিসফিস করে বললেন, আপনার জন্য অপেক্ষা করছি শুধু। চলুন।

এ-ঘর থেকে সে-ঘর হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে তিনজনে থমকে দাঁড়ালুম। ফোঁস ফোঁস গর্জন থেমে গেছে। কর্নেলের ইঙ্গিতে গুঁড়ি মেরে বসলুম। তারপর একটা প্রকাণ্ড ফাটল দিয়ে দেখি, নিচের ছোট্ট একটা ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং একজন বসে আছে। তার সামনে কি ওটা ধুনির আগুন?

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি চাপা স্বরে বলল, আজ রাতের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই।

বসে থাকা লোকটি বলল, হাত ব্যথা করছে। কৈ, দিন। আর এক চুমুক খাই।

না। আর খেলে তুমি কাজ করতে পারবে না। শোনো! যেটুকু মাল আছে, আর এক ডজন বিস্কুট হবে। তাই না?

তা হতে পারে।

বজ্জাত সাধনটা খানিকটা না হাতালে অন্তত আরও হাফ ডজন বিস্কুট হতো। আমার অবাক লাগছে, ও টের পেল কী করে? তুমি নেশার ঘোরে বলে ফেলোনি তো?

আমার মাথা খারাপ? অর্ধেন্দু মাস্টার টের পেয়েছিল কী করে?

টের পেয়েছিল। কিন্তু সে তো মালটা দেখেনি। তবু বিস্কু নিইনি। নাও! হাত চালাও!

বসে থাকা লোকটা নড়ে বসল এবং কী একটা জিনিসে চাপ দিল। অমনি ফোঁস ফোঁস শব্দ করে ধুনির আগুন চাঙ্গা হলো। অমনি বুঝতে পারলুম, সাপের গর্জন নয়। ওটা একটা চামড়ার হাপর।

তারপর দেখি, একটা ভাঙা চকচকে জিনিস সে গরম করে নিয়ে একটা পাত্রে ঢালছে এবং অ্যাসিডজাতীয় কিছু মেশাচ্ছে। কী অদ্ভুত! নিমেষে বুঝলুম কাজটা কী হচ্ছে। সেই সোনার শিবলিঙ্গ আগুন এবং অ্যাসিডে গলিয়ে লোকটা সোনার বিস্কুট তৈরি করছে।

কর্নেলের ইঙ্গিতে আমরা দুজনে বাঁদিকে একটা ভাঙা দরজা গলিয়ে গেলুম। তারপর অন্ধকারে অনুমান করে পা ফেলতে ফেলতে নেমে গেলুম। সামনে একটা প্রকাণ্ড লাইমকংক্রিটের চাঙড়। তার ওধারে সেই ছোট্ট ঘরে সোনার বিস্কুট তৈরি হচ্ছে।

হঠাৎ একটা শব্দ হলো নিচে। তারপর উঁকি মেরে দেখি, এক জটাজূটধারী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ত্রিশূল বাগিয়ে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অমনি দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা কয়েক পা সরে গেল। স্বর্ণকার লোকটি যে পশুপতি, তা বুঝে গেছি। সে যেন তৈরি ছিল। একলাফে ত্রিশূলটা ধরে ফেলল। তার সঙ্গী এবার হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে এল। তার হাতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ! সিরিঞ্জটা অদ্ভুত গড়নের। কারণ ওটাতে দুটো সূচ পরানো আছে।

সে হিসহিস করে বললে, তবে রে ব্যাটা! মর তবে শঙ্খচূড়ের ছোবলে।

সাধুর শরীর যে দুর্বল তা বোঝা যাচ্ছিল। তিনি ধস্তাধস্তিতে মাটিতে পড়ে গেলেন। আতঙ্কে চোখ বুঝলুম।

তারপরই কর্নেল এবং রমেন্দ্র মণ্ডলের টর্চ জ্বলে উঠল। দুজনেই বিভলভার বের করে ঘরের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কর্নেল বললেন, হরেকৃষ্ণবাবু! ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা আগে দিন। নয় তো গুলি করে হাত ভেঙে দেব।

ও সি এবার হুইসল বাজালেন। নিচে গঙ্গার দিক থেকে একদঙ্গল পুলিশ এসে গেল। কর্নেল হরেকৃষ্ণবাবুর হাত থেকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জটা নিতে গেছেন, হঠাৎ হরেকৃষ্ণবাবু সেটা মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙে ফেললেন। কর্নেল তাঁর মাথার হনুমানটুপি খুলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল রঙের চুল।

আমার মনে পড়ল, কর্নেল নৌকোয় শুয়ে থাকা লোকটির মাথা দেখেই নাকি চিনতে পেরেছিলেন, সে মৈত্রেয়ীকে মেরে ফেলত। তা হলে কর্নেল লাল চুল দেখেছিলেন।

পশুপতি হাউমাউ করে কাঁদছিল। তাকে নাকি প্রাণে মারার ভয় দেখিয়ে এখানে এনে সোনার বিস্কুট তৈরি করতে বলতেন হরেকৃষ্ণবাবু। দুজন কনস্টেবল তাকে চ্যাঙ-দোলা করে নিয়ে গেল। এস আই অমলবাবু বললেন, পশুপতিকে নৌকো করে নিয়ে যাক। হরেকেষ্টকে জলের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার রিস্ক্ আছে। হরেকেষ্ট নৌকো আর জলের ব্যাপারে নাকি ওস্তাদ।

রমেন্দ্রবাবু বললেন, ওর নৌকোটা খুঁজে পেয়েছেন তো?

হ্যাঁ সার! নিচেই বাঁধা ছিল।

অমলবাবু হরেকৃষ্ণবাবুর দুহাত পেছনে টেনে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। তারপর কনস্টেবলদের সঙ্গে ওপরে উঠে গেলেন।

কর্নেল সন্ন্যাসীকে ডাকলেন, মহেন্দ্রজি! আপনার দেবতার সোনা আপনি যাতে ফিরে পান, তার ব্যবস্থা করব। আবার আপনি শিবলিঙ্গ তৈরি করিয়ে নেবেন।

সন্ন্যাসী হু হু করে কেঁদে উঠলেন। কর্নেল তাঁকে মেঝে থেকে টেনে তুলে বললেন, মিঃ মণ্ডল! আপনি সোনার বিস্কুট, শিবলিঙ্গের টুকরো এবং আর যে সব জিনিস আছে, সাবধানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। ওই যে একটা চটের থলে পড়ে আছে দেখছি! হরেকৃষ্ণবাবু আয়োজন মন্দ করেননি। চলুন মহেন্দ্রজি! এস জয়ন্ত!...

মহেন্দ্রজিকে নিয়ে আমরা তাঁর ভাইপোর ফার্মহাউসে ফিরে গিয়েছিলুম। রাজু তাঁকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। কর্নেল তাকে মুখ বুজে থাকতে বলেছিলেন। ফার্মহাউসে তখন লোকেরা গভীর ঘুমে অচেতন।

আমাদের ঘরে গিয়ে মহেন্দ্রজি বলেছিলেন, সংসারে বাস করার একটুও ইচ্ছা আমার নেই। আমি মোহনের ওপর রাগ করে চলে গিয়েছিলুম। কারণ তারও দোষ ছিল। দশ বছর আগে আশ্বিন মাসে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। গঙ্গামাঈ পাগলী হয়ে গিয়েছিল। ওই বাড়িতে তখন আমি একা থাকতুম। মন্দিরে থেকে তপজপ করতুম। ঝড়বৃষ্টি এবং গঙ্গামাঈজির অবস্থা দেখে আমার ভয় হয়েছিল। মন্দির থেকে বিগ্রহ উপড়ে তুলে ফেলায় আমার পাপ হয়েছিল। তা না হলে দেবতা আমার হাত-ছাড়া হবেন কেন? তবে সে অনেক কথা।